পরমায়ু

পরমায়ু

সন্তোষকুমার ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

কিনু গোয়ালার গলি

নানা রঙের দিন

সন্তোষকুমার ঘোষের শ্রেষ্ঠ গল্প

চিনেমাটি

শুকসারি

মোমের পুতুল

পারাবত

কড়ির ঝাঁপি

মনে মনে

এখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়াটুকুই যা বানানো গল্পের মত ঠেকতে পারে ;. নইলে ঘটনাটা সত্যি হতে সত্যিই কোন বাধা ছিল না।

প্রাচীন কালের লেখকদের হাতে এর চেয়েও ঢের অসম্ভব ব্যাপার ঘটেছে। ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়া হঠাৎ খেপে গেছে। পাহাড়ে-পথে মোটরের ব্রেক গেছে বিকল হয়ে।

গল্প জমাতে হলে অমন একটু আধটু জোড়া দিতে হয়। রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে; কিন্তু ট্রেনের কামরায় পূর্ব পরিচিতাকে সে কথা বলবার সুযোগ ক'জন পায়।

পায় না। আসল জীবনে দেখাই হয় না। হলে চেনে না। চিনলেও কথা বলতে ভরসা হয় না। হলে, ছেলে-পুলে, পেনসন ইত্যাদির খবর বিনিময় হয়।

বিধাতার এই এক আশ্চর্য খেয়াল। দু'টি রাজপথ নানা পাড়া পাড়ি দিয়ে এক মোড়ে এসে মেশে, শত শত বাঁক ঘুরে দু'টি নদী এক হয়, অথচ ছাড়াছাড়ি-হওয়া দু'টি জীবন কিছুতেই যেন আর মেলে না। কেন? শহরতলীর এই হাসপাতালে ক'মাস বালিশে মুখ রেখে সুজাতা বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, কেন? আজ সেরে ওঠার সার্টিফিকেট নিয়ে লোকাল ট্রেনে কলকাতা ফিরতে ফিরতেও সেই একই প্রশ্ন করেছে, কেন? পাকা লিখিয়ে বলেই কি বিধাতা কাঁচা একটা নাটক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা এড়িয়ে গেলেন। নইলে, এই দু'মাস বিছানার সঙ্গে মিশে-থাকা মেয়েটি মনে মনে যে স্বপ্ন রচনা করেছিল, করে হয়ত নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল, সেটুকু তার নিজের কাছে ত মন্দ লাগেনি।

থার্মোমিটার হাতে নিয়ে যে লোকটা 'নিরাময়ে', শহরতলীর এই হাসপাতালে, তিন বেলা ব্যস্তসমস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করে, পরনে যার ধুতির উপরে সাদা কোট, তার সুবিমল হতে ত কোন বাধা ছিল না।

চেহারার মিল দেখে সুজাতা প্রথম দিনই চমকে উঠেছিল। কতকটা সঙ্কোচে, কিছুটা-বা ভয়ে, ও-দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। তার পর লোকটি যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, তখন ফের মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে চেয়েছে। হুবহু সেই মুখ, চলার ভঙ্গিটাও যেন এক রকম। কপালের কাছে চুলগুলো পাতলা। এই দশ বছরে সুবিমলেরও চুল পাতলা হত। রং তামাটে? প্রৌঢ় বয়সের চৌকাঠে পা দিয়ে সুবিমলেরও রঙ ময়লা হয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কম দিন ত নয়। সুজাতার নিজের স্বাস্থ্যে আর মুখশ্রীতেও কি গ্রহণ লাগে নি, ঢলঢল চোখ দু'টি হয়নি চৈত্রের কুয়ো? তবে!

সুজাতার নিজের মনেও অবশ্য খটকা ছিল। নইলে সেই প্রথম দিনের পর থেকে লোকটিকে কতবার ত বাইরের বারান্দা দিয়ে যেতে আসতে দেখেছে, একদিনও সোজাসুজি ডেকে জিজ্ঞাসা করতে ভরসা হয় নি কেন। পাছে খেলাটুকু ভেঙ্গে যায়? পাছে লোকটি বলে বসে, 'আপনি ভুল করেছেন। আমার নাম সুবিমল নয়। আমি এখানকার মেল নার্স।'

শহরের সীমার বাইরে বেশ কয়েক মাইল সটান চলে এসে এখানে পৌঁছে ট্রাঙ্ক রোডটা যেন হঠাৎ বেয়াড়া ঘোড়ার মত ঘাড় বেঁকিয়েছে। এখানে তার আকৃতিটাও ঘোড়ার খুরেরই নালের মত। সব উদ্দাম গতি—লরি, বাস, মোটর যাই হোক না কেন—মোড়টার মুখে এসে থমকায়। ধুলোর ফেউগুলো পিছিয়ে পড়ে। চালক একই সঙ্গে সঙ্কেতের জন্য হর্নে হাত দেয়, ব্রেকে পা ঠেকায়। আরোহীরা সেই অবসরে দেখে কংক্রীটের কালভার্টটা, নয়ানজুলির এ-পাশের শাহী সড়ক আর ও-পাশের উঁচু জমির মধ্যে যে ঘটকালি করছে। শুধু কালভার্ট কেন, সেকেলে দোতলা বাড়িটাও চোখে পড়ে, দু-ইঁট পুরু একটা পাঁচিল ফাঁপানো একটা ঘাগরার মত যার কোমর জড়িয়ে আছে।

ঘাগরা নেহাৎ কষ্টকল্পনা নয়। জনশ্রুতি, একদা এটা বাগানবাড়ি ছিল। ঘুঙুর-পরা পায়ের ঘায়ে কঠিন মেঝে ককিয়ে উঠত। ইদানিং ভোল বদলেছে। রূপ আর পরিচয় দুইই। শাহী সড়কে

ছায়া-দেওয়া শিরীষ গাছে নতুন পরিচয় একটা টিনের পাতে লেখা আছে , 'নিরাময়'। ক্ষয়রোগগ্রস্তদের হাসপাতাল।

জানালার বাইরে বিকালের রোদ রোজ রোজ মরে। সুজাতা চেয়ে চেয়ে দেখে। আকাশটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়ে যায়। এও যেন একরকমের ক্ষয়রোগ। সদর রাস্তার শিরীষের ডালে বাসার দখল নিয়ে তু-দল পাখির কলহ কান পেতে শুনতে মন্দ লাগে না। শেষ আলোটুকুও এক সময় ফুরোয়। তখন কাঁধে মই নিয়ে ব্যস্তসমস্ত কারা যেন ছুটোছুটি করে আকাশের মোড়ে মোড়ে একটির পর একটি নিবু-নিবু তারার বাতি জেলে দিয়ে যায়। খোলা জানালার ফাঁকে ঝিরঝিরে হাওয়া, প্রাঙ্গণের বেলফুলের ঝাড় থেকে সুজাতার জন্যে যে চুরি করে এনেছে সৌরভ, আর নিম গাছের পাতায় রাহাজানি করে তার জীর্ণ ফুসফুসের জন্যে অনেকখানি অক্সিজেন।

লোকটি সুবিমল হলে তখন হয়ত একবার আসত।

সেই তাজা হাওয়ায় বুক ভরে নিয়ে অলস চোখ তুটি বুঁজে সুজাতা অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা বলতে পারত।

'অনেক দিন পরে দেখা হল।'

'অনেক দিন।'

'আঙুলে গুনে দেখলুম দশ বছর।'

'আমাকে আঙুলে গুনতে হয় নি। হিসেব মনে আছে। কত বুড়ো হয়ে পড়েছি দেখছ না। রোদে-পোড়া মুখ, মাথায় টাক। তুমি কিন্তু আরও ফর্সা হয়েছ।'

সুজাতা বালিশে মুখ-রাখা নিজের খিলখিল হাসি শুনতে পেত। 'নতুন আলুর মত'? 'আরও কিছুদিন ভুগতে দাও, দেখবে শেষ রক্তটুকু দিয়ে মেম সাহেবের গায়ের রঙ কিনে নিয়েছি। বয়স কিন্তু আমারও কম হল না সুবিমল। বাংলা প্রবাদের হিসেবে তু'বার বুড়ি হতে মোটে আট বছর বাকি। চুল উঠে উঠে মাথা একরকম সাফ হয়ে এল, চিরুনি টেনে কোনরকমে ঢেকেঢুকে রাখি।'

'বয়স ত বাড়বার জন্যেই।'

'তাতো দেখছিই। যখন ছোটটি ছিলুম তখন এক একটি জন্মদিনে কী যে ফুর্তি হত। বড় হচ্ছি, একটু একটু করে, মেয়ে হচ্ছি। বয়সের জলে পায়ের পাতা ডুবিয়ে যেন মজা দেখেছি। সেই জল এখন পা, হাঁটু, কোমর, বুক ছাপিয়ে গলা অবধি উঠে এসেছে, এই অসুখে যদি না-ও মরি, বয়সের বানে ডুবে মরব। ভয় পেয়েছি কি সাধে?'

লোকটা সুবিমল হলেও তার সঙ্গে হয়ত এসব কথা হত না। হাজার হোক এটা হাসপাতাল, মেল নার্সের সঙ্গে রোগিণীর গাঢ়-গলা আলাপ কি সাজে। বড় জোর কুশল সমাচার বিনিময় হত। সুজাতা জানতে চাইত, সুবিমল পশ্চিমে একটা শহরে ভাল একটা কাজ নিয়ে চলে গিয়েছিল বলে জানত, এই হাসপাতালের মেল নার্সের চাকরিতে কী করে, কবে থেকে, জুটল। নিজের কথাও কিছু বলতে হত বই কি! বলত, 'টাইপিস্টের কাজ নিয়েছিলুম। হাড়-ভাঙা খাটুনি, উপরন্তু গানের টিউশনি। একটু একটু করে ক্ষয়ে ক্ষয়ে অবশেষে দেখছ ত, এখানে। ওপারের টিকিট কেটেছি, তোমাদের এই হাসপাতালটা গাড়ি বদলানোর ইস্টিশন, কেমন?'

'বাজে কথা বলো না।' সরা-ঢাকা ঘড়ার মত থমথমে গলায় সুবিমল বলত, 'তোমার এমন কিছু হয় নি। প্লেট দেখেছি। দু-দিনে সেরে যাবে।'

'ভরসা দিচ্ছ? প্রথম যখন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে এটা দেখা দেয়, তখনও একজন ডাক্তার এই কথাই বলেছিলেন। তারপর এই দু'বছর ধরে আশ্বাসের সিঁড়ি বেয়ে ক্রমাগত নিচেই নেমে এলুম সুবিমল।'

তারপর, বলা যায় না, সব সঙ্কোচ জয় করে সুজাতা হয়ত সীতাদির কথাও জিজ্ঞাসা করতে পারত। 'তোমার বাসা কতদূর বল। সীতাদি এখানেই ত। একদিন নিয়ে এস, কেমন?

পরম মমতায় সুজাতা মনে মনে সংলাপের ঊর্ণাজাল বুনে গেছে। সুবিমলকে বলতে শুনেছে, 'সীতা ত নেই, সুজাতা।'

নেই ? শুনে থরথর হাতে লোহার খাটটা চেপে ধরে সুজাতার নিজেকে সামলাতে হত। 'কী হয়েছিল ? অবশ্য ছোটখাট অসুখ ওর লেগেই থাকত, বরাবর দেখেছি।'

'ছোটখাটো নয়।' সুবিমল ধীরে ধীরে বলত, 'বড় অসুখে মরবার সম্মান থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। ক্যানসার হয়েছিল।'

এখানে একটু দম নিতে হত সুবিমলকে, আবার বলত, 'এ-রোগের চিকিৎসা নেই, তবু যথাসাধ্য করেছি, বিশ্বাস কর, নিজ হাতে প্রাণ দিয়ে তাকে নার্স করেছি।'

'জানি, প্রাণ ঢেলে সেবা করতে তুমি পার। মাসিমার—তোমার মার—অসুখের সময় দেখেছি ত।'

এর পর কিছুক্ষণ কারও মুখেই কথা থাকত না। শেষে সুজাতাকেই রসিকতার অর্ধসফল প্রয়াস করে বলতে হত, 'নিয়তি দেখ। আমার কপালেও শেষ ক'টা দিন তোমার হাতের সেবা লেখা আছে।'

চেনা মুখ নয়, চেনা-চেনা। যেন সুবিমলের। রোজ সকাল হয়, রোদ ভিজে-ভিজে, যার চোখ থেকে এখনও ঘুমের ঘোর কাটে নি, প্রাঙ্গণের সবুজ ঘাসের বিছানাটুকু পেয়ে সেখানেই ফের শুয়ে পড়ার উপক্রম করে। তারপর গড়াতে গড়াতে চলে আসে বারান্দায়। চৌকাট পেরিয়ে ঘরের ভিতরেও উঁকি দেয়। কোথা থেকে নেমে আসে একজোড়া চড়ুই, কী আছে এখানে, কী পায়, কী খায় ওরা, কে জানে। উর্দিপরা চাপরাসী পুব-জানলার পর্দা টেনে দিয়ে যায়। শিরীষ গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালিটার তরতর উঠে যাওয়া আর দেখা হয় না। থার্মোমিটার হাতে আজানু সাদা কোট পরা লোকটিকে দেখা যায় তখন। এ-ঘরে যদিও ঢোকে না। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে হয়ত তাকায়, হয়ত তাকায় না। ঢোকে না বলেই সুজাতার সন্দেহ আরো বাড়ে।

ভুল নিয়ে মনে মনে খেলার নেশা তখন আবার জমে ওঠে। এও কি এক রকমের জ্বর বিকার, সুজাতা নিজেই কখনও কখনও ভাবে।

কিন্তু জ্বর ত নেই। আজই ত চার্ট লিখতে লিখতে নার্স হেসেছে।
—'একেবারে রেমিশন হয়ে গেছে। সেরে গেলেন বলে। ভরসা-গাঢ় কয়েকটি কথা সুজাতার কপাল ঠাণ্ডা আঙুলের মত ছুঁয়ে গেছে।

একেবারে মিছে সান্ত্বনা নয়, সুজাতা নিজেও টের পায়, সে সেরে উঠছে। অলক্ষ্যে একটু একটু করে বদলে গেছে শরীর, বুক ভরে শ্বাস নিতে আর যেন তেমন কষ্ট নেই। ধুকধুক কলিজা আগের আগের তুলনায় ঢের সবল। হাত-আয়না সামনে রেখে চোখের পাতা টেনে টেনে পরখ করে, কতটুকু রক্ত জমল। কালিটুকু মুছে গেল কিনা। চোয়ালটা আর বুঝি টিলার মত মাথা তুলে নেই, সমতলের সঙ্গে মিশে নিটোল হয়েছে।

ডাক্তার এক দিন পরীক্ষা করে হেসে বলেন, 'এবার আপনি রোজ সকালে আর বিকেলে বাগানে পায়চারি করতে পারেন।'

যখন এসেছিল তখন আষাঢ়-আকাশের মাতঙ্গী রূপ, মেঘের ধূমল শুঁড়ে জল তুলে তুলে অবিশ্রাম ঢালছে। এখন, এই কার্তিকে, সে ধূমাবতী। বাইরে পা দিয়ে সুজাতা অবাক হয়ে গিয়েছিল। জোর নেই, এটুকু আসতেই কেমন মাথা ঘুরছে, শরীর টলছে। প্রথম দিন আর এগিয়ে যেতে ভরসা হয় নি, ওখানেই একটা বেঞ্চে বসে পড়ে সুজাতা আঁচলে কপালের ঘাম মুছেছে। আবার পা টিপে টিপে দেয়াল ধরে ফিরে এসে বিছানা নিয়েছে। খাঁচার পাখি নির্মম নি-ঘের মুক্তি সইতে পারে নি, ভয় পেয়ে ছাতু-জলের বাটিতে মুখ রেখে ধুঁকছে। জানালার শিকের বরফিকাটা আকাশের টুকরোই তার ভাল। একটা গোটা আকাশ বড় একা, বড় নিঃসীম।

খটখট জুতো পায়ে একজন ওর বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে। দু'চোখ বুঁজে সুজাতা শুয়ে, তবু অনুভূতিই তৃতীয় নেত্র হয়ে তাকে বলে দিয়েছে কে। ওর বিছানার পাশে যে এল, থমকে দাঁড়াল, ওকে শ্রান্ত দেখে আবার ফিরে গেল, সে যদি সুবিমল হত তবে সুজাতা তাকে এভাবে ফিরে যেতে দিত না। যাবার সময় হয়ে এল, অথচ এখনও কোন বোঝাপড়া হল না যে! এতকাল পর দেখা, তবু

পুরনো কাল নিয়ে দু'জনের কোন কথাই হল না। সুজাতার ভুলটা যদি ভুল না হত তবে ওর কনুইয়ে ভর দিয়েই সে অন্তত পিছনের নিরিবিলি বারান্দা অবধি যেতে পারত। এক কোণে মোড়া কিম্বা ডেক চেয়ার নিয়ে বসত দু'জনে। কী কথা দিয়ে শুরু হত ? তা কি বলা যায় ? ছোটখাটো কত ঘটনাই ত মনের ঝাঁপিতে তোলা আছে। তার একটা পেড়ে নিয়ে কথা শুরু করলেই হল।

—তোমার মনে আছে সুবিমল, সেই যেদিন তোমার উপর প্রথম রাগ করেছিলুম ? খুব চটেছিলুম কিন্তু। বিকেল থেকে ময়দানে বসে আছি, সাড়ে পাঁচটায় তুমি আসবে। বারবার বড় ঘড়িটার দিকে চাইছি। ছ'টা বেজে গেল, চৌরঙ্গীর বড় ঘড়িটা পূর্ণিমার চাঁদের মত জ্বলে উঠল, তখনও তোমার দেখা নেই। অতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলুম কেন, কে জানে, তুমি একেবারে সাতটা বাজিয়ে এলে। কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে থাকার ছেলেমানুষীটুকু করিনি, থমথমে মুখে বললুম, 'এত দেরি ?' আমার পাশেই তুমি ধপ করে বসে পড়লে। আমার আঁচলেই কপালের ঘামটুকু মুছে ফেলতে ঝুঁকে পড়লে। বললে, 'কী করি। দুপুর থেকেই মার অসুখটা খুব বেড়েছিল। ডাক্তার ডেকে ঘুম পাড়িয়ে তবে আসতে পারছি।'

সেই প্রথম তোমার মায়ের অসুখের কথা শুনলুম। এত দিন তোমার পরিবারের কথা কখনও সবিশেষ বলনি! হয়ত আমিও শুনতে চাইনি। সে দিনই প্রথম সব খুলে বললে। বিধবার একমাত্র ছেলে তুমি। বাবা সামান্য যা কিছু রেখে গিয়েছিলেন, তাই দিয়ে লেখাপড়া শিখেছ। জ্ঞান হবার পর থেকেই দেখেছ মা রুগ্না। তুমি শুধু তাঁর ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানেরও ভরসা। সংসারে কেউ ত নেই, রোগীর সব কিছু ভার তোমার। সেই রোগ ক্রমে জটিলতর হয়েছে, বাতে মার একটা অঙ্গ অসাড়। তাঁকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ওষুধ যোগানো, পথ্য দেওয়া, সব নিজ হাতে করতে হয়।

সেদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তোমার অনুরোধে তোমার বাসায় গিয়েছিলুমও একদিন। গিয়ে দেখেছি, তোমার কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি। তোমার মা নির্ণিমেষ চোখ মেলে আমাকে দেখছিলেন, আমি কিন্তু দেখছিলুম তোমাকে। ফীডিং কাপ, গরম জলের ব্যাগ, দাগ-কাটা শিশিবোতল, মেজার গ্লাস দিয়ে তোমার জীবনের অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছ।

অস্বীকার করব না, সুবিমল, সেদিন তোমাকে শ্রদ্ধা যতটা করেছি, ভয়ও করেছি তত। সহানুভূতির সঙ্গে একটু বিরাগ মিশেছিল। সেই প্রথম টের পেলুম এতদিন যে সুবিমলকে জেনেছিলুম সেটা তার মেকি পরিচয় মাত্র। আসল পরিচয় আছে এই ঘরে, যেখানে সে একটি রোগী-পরিচর্যায় প্রহরের পর প্রহর কাটিয়ে দিতে পারে। বাল্যে পিতৃহীন একটি শিশুর সঙ্গে তার মার সুখে দুঃখে যে শরিকানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, একজনের রাজভোগে, আরেকজনের সেবায়, সেই শরিকানার দলিল পাকা হয়েছে।

এই শরিকানার ভাগ আমিও নিতে পারতুম। কিন্তু তুমি, তোমরা, দিতে রাজী হবে কিনা সেই ভয়ও সেদিনই মনে ঢুকল।

আশ্চর্য, তবু কিন্তু তার পরেও অনেকবার তোমাদের বাসায় গিয়েছি। রোগীর বিছানায় জোড়া, মালিশের গন্ধে ছাওয়া একটি শীতল ঘর আমাকে যেমন ঠেলেছে তেমনি টেনেছে।

এত কথা সুবিমল ওকে এক সঙ্গে বলতে দিত কিনা সন্দেহ। সুজাতা কল্পনা করেছিল, সে বাইরের বারান্দায় ডেকচেয়ারে আধশোয়া হয়ে কথা বলছে, পায়ের কাছে মোড়া টেনে শুনছে সুবিমল। একটু দূরেই বিলের ধারে শিউলি ফুলের ঝাড়। ওদিকের পাড় ঘেঁষে পদ্ম পাতার আড়ালে যে পাখিটা থেকে থেকে মাথা তুলছে, ফের ডুবছে, তার নাম সুজাতার জানা নেই। আরও দূরে উঁচু ঢিবিটার উপরে কয়েকটি কিশোর বাবলা গাছের জটলা।

সুবিমল ওকে অবশ্যই বাধা দিত। বলত, 'তুমি সবে সেরে উঠছ, এখন এসব কথা থাক। উত্তেজিত হবে, সেটা কিছুতেই উচিত নয়।'

এত দিন পরে সুযোগ পেয়ে সুজাতা সে মানা শুনত কি? ফুঁ দিয়ে ধোঁয়ার মত আপত্তিটাকে উড়িয়ে দিত। পুরনো কথার খেই ধরে ফের শুরু করত—সেদিন তোমাকে বুঝেছিলুম সুবিমল, কিন্তু সবটুকু নয়। সন্ধ্যা হতেই তুমি ব্যস্ত হয়ে উঠতে, তোমাকে কিছুতে ধরে রাখা যেত না। গোড়ার দিকে অভিমান হত, শেষে আর মনে কিছু করতুম না। জানি ত, ওই সময়টাতে তুমি তোমার মাকে ধরে ধরে সামনের ছাতটুকুতে নিয়ে যাও; যতক্ষণ না হিম পড়ে, ততক্ষণ গল্প কর। একবার আমাদের বরানগরের পিকনিক থেকে পাঁচটা না বাজতেই তুমি ছুটে পালিয়ে এসেছিলে, মনে আছে ত?

আচ্ছা, সীতাদির সঙ্গে সেই সময়েই ত তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলুম? তোমার মা তখনও বেঁচে। আলাপ হল, এইমাত্র। এর বেশী কিছু তোমাদের মধ্যে তখনই ঘটেছিল বলে মনে করিনে। ঘটলে টের পেতুম। জান ত, এসব ব্যাপারে মেয়েদের সহজাত বোধই গুপ্তচরের কাজ করে। সীতাদি সবে তখন গ্রাম থেকে এসেছে, মেলা-মেশার ব্যাপারে তখনও আনাড়ি, জড়োসড়ো। দু' একটা কথা বিনিময় হতে হতেই ওর সাহসের দম ফুরিতে যেত। আমি কিছু সন্দেহ করিনি আরও এই জন্যে যে, ওর বয়স ঢের হয়েছিল, ছেলে-বেলা থেকে ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে চুল উঠে গেছে। সেই কাঠি-সার, প্রায় অশিক্ষিত, মুখচোরা, গ্রাম্য কালো মেয়েটিকে আমার মত কলেজে পড়া মেয়ে, লোকে যাকে বলে সুন্দরী, হিংসে করতে যাবে কী দুঃখে? তোমার রুচির উপরেও আমার ভরসা ছিল।

রূপ আর স্বাস্থ্য যে সব নয়, অন্তত সকলের কাছে সব নয়, সেটা বুঝতে আমার আরও কয়েক মাস লেগেছিল। যেদিন বুঝলুম, সেদিন তোমাকে বুঝতেও আমার কিছু বাকী রইল না।

উৎসাহ দেখিয়ে কোন দিন জানতে চাও নি, তবু আমার কাছেই মাঝে মাঝে সীতাদির কথা শুনেছ। সম্পর্কে আমার পিসতুতো বোন, জন্ম থেকেই অসুখে ভোগে। একবার কালাজ্বরের পর থেকে কী

অসুখ হয়েছে, চোখে যন্ত্রণা, রোজ মাথা ধরে। পড়াশুনো সেজন্যেই হয় নি। কলকাতা এসেছে চিকিৎসা করাতে।

সীতাদির উপর কেমন একটা মায়া বসে গিয়েছিল, তাই আগ্রহ করে ওর কথা তোমাকে বলতুম। তুমি মন দিয়ে হয়ত শুনতেও না। কখনও উদাসীন গলায় হয়ত বলতে, ও।

তোমার মার মৃত্যুর চার মাস পরের সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ে সুবিমল ? কলেজ থেকে ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। জানতুম তুমি আমার জন্যে এসে বসে থাকবে। ততদিনে মা বাবার সম্মতি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং আমাদের বাসায় আসতে তোমার বাধা ছিল না। ফিরে এসে দেখি বাইরের ঘর অন্ধকার। মা উপরে বোধ হয় পুজোর ঘরে। বুঝলুম, তুমি আসনি। জুতো ছাড়লুম বাইরের ঘরেই। বই খাতা ছুঁড়ে দিলুম টেবিলে। কলে মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এসে মনে হল, সীতাদির সঙ্গে খানিক গল্প করিগে।

সেই ঘরে তুমি ছিলে। নীল একটা নিষ্প্রভ আলোয় ঘরটা না-স্পষ্ট না-অন্ধকার, তবু সীতাদির শিয়রে বসে তোমাকে জলপটি দিতে দেখতে পেয়েছি।

আমি পিছিয়ে এসেছিলুম। তুমিও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসেছিলে। হাতে ওডিকোলনের শিশিটাকে কেন এনেছিলে আজও বুঝতে পারিনি। তুমি কি ভেবেছিলে ওটাকে কাজে লাগাবে ? একবার বোকার মত জিজ্ঞাসা করলে, আমার ফিরতে দেরি হল কেন, জবাব পাবার আগেই নিজে থেকে বললে, 'তোমার সীতাদি শুনলুম সারা বিকেল মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাই—'

তোমার বোধ হয় মনে আছে সুবিমল, কথাটাকে শেষ হতে দিইনি। ঘরে ঢুকে সীতাদির কপালে হাত রেখেছি। অত্যন্ত নির্বোধের মত বলেছি, 'তাইত, খুবই মাথা ধরেছে দেখছি। ভাগ্যিস তুমি ছিলে।' বাইরের ঘরে ডেকে এনে সেদিন রাত ন'টা অবধি তোমার সঙ্গে হেসে নানা গল্প করেছি। কলেজের সোশ্যালে আমার ছোট পার্টটুকুও গুনগুন গলায় তোমাকে শুনিয়ে দিয়ে

থাকব। গেট অবধি পৌঁছে দেবার সময় আমার হাত তোমার মুঠোয় ধরা ছিল, ছাড়াছাড়ি হবার আগে একবার কাছেও টেনে নিতে চেয়েছিলে, বাধা দিইনি।

তুমি সেদিন নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিলে। আমাকে ঈর্ষাদ্বেষহীন দেবী বা ওই রকম কিছু ভেবে থাকবে। এখন ভাবি সুবিমল, তুমি হয় বোকা, নয় বোধশূন্য পাথর ছিলে। আমি সেদিন নিজেকে সমর্পণ করেছিলুম কেন জান? সেই শেষ বলে।

কেননা তোমাকে আমি চিনে নিয়েছি। যেটুকু বাকি ছিল সেটুকুও আয়নার মত ঝকঝকে হয়ে গিয়েছিল। না, তোমাকে লম্পট বা দুরাচার ভাবিনি। তোমার মায়ের রোগশয্যার ছবি সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে উঠেছিল যে। বুঝেছি আমার নীরোগতাই আমার কাল। তোমার মার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমার শৈশব থেকে অর্জিত অভ্যাস ত যায় নি। একটি রোগীর শিয়র তোমার চাই। স্তন থেকে স্তনান্তরে গিয়ে শিশু যে আশ্বাস পায়, এও তাই। সেদিন বুঝেছি, কালো হোক, অশিক্ষিত হোক, সীতাদির কাছে আমার হার হবেই।

পায়ের কাছে মোড়া নিয়ে নেহাত সুবোধ বালকের মত যে একটানা কথা এতক্ষণ শুনে গেছে তার দিকে তাকিয়ে হয়ত সুজাতার করুণা হত। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলত, 'জান আমার ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেছে? এখানে আর তিন চার দিন, কি বড় জোর সাত দিন। তারপর আবার একটা ইস্কুল মাস্টারি কি যা হোক কিছু কি জুটবে না?'

সুবিমল তবু মাথা নিচু করে বসে থাকত। শেষে তার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে সুজাতাকেই বলতে হত, 'কিছু বলছ না যে। কোন কথা কি বলবার নেই?'

হয়ত মাথা তুলত সুবিমল। জড়িত ধীর গলায় বলত, 'আছে। কিন্তু সাহস নেই। এখনও ভাল করে সেরে ওঠ নি। এখুনি আবার চাকরিতে কেন ফিরে যাবে সুজাতা?'

এবার সুজাতাকে হেসে উঠতে হত। '—যাব না? তবে খাব কী। আমার এমন কে আছে সুবিমল, যে আমাকে বসিয়ে রেখে খেতে দেবে? জীবনের শেষ পুঁজিটুকু খরচ করে এখানে এসে চিকিৎসা করালুম সে কি পরে অনশনে মরবার জন্যে?'

এইখানে একটা নাটক ঘটতে পারত। সুবিমল হয়ত মোড়াটাকে ওর পায়ের আরও কাছে নিয়ে আসত, অধৈর্য্যের মত ওর হাত চেপে ধরে বলত, 'তুমি শুধু অতীতের কথা বলছ সুজাতা, যা শেষ হয়ে গেছে তার ছায়া দিয়ে যা হতে পারে তাকে আড়াল করে রাখতে চাইছ।'

সুজাতাকে অবশ্য হাত ছাড়িয়ে নিতে হত। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গলায় বলতে হত, 'কী হতে পারে।'

—'সব ভুল বোঝাবুঝির শেষ।'

এই ক'মাস ধরে সুজাতা এই মুহূর্তটিরই ত আশঙ্কা এবং প্রতীক্ষা করেছে? তবু তাকে বলতে হত, 'সুবিমল, তা হয় না। সীতাদিকে আমি ভুলি নি।'

'কিন্তু সুজাতা, সীতা ত আজ নেই।'

'সুবিমল, তবু হয় না। সে মন নেই, সে বয়স নেই। তা ছাড়া দেখছ ত, আমার এই অসুখ।'

গাঢ় গলায় সুবিমল বলতই,—'এ অসুখ তোমার থাকবে না, সুজাতা, তুমি সেরে উঠছ, সেরে উঠবে। আমি তোমাকে সেবা করে সারিয়ে তুলব।'

এইবার সুজাতাকে খিলখিল গলায় হেসে উঠতেই হত।—'আমার ভাবনাও ত সুবিমল সেই জন্যেই। এই অসুখ আমার চিরকাল থাকবে না। সেরে উঠব। তখন আমার কী উপায় হবে।'

—'হেঁয়ালিটা কিছু বুঝতে পারছি না।'

—'বুঝতে পারছ না?' গড়িয়ে-পড়া শিশি থেকে ফোঁটাফোঁটা বিষ যেন ঝরছে, সুজাতার গলা এমন তিক্ত।—'বেশ, আরও স্পষ্ট করে বলছি। তোমাকে যদি এতটুকু চিনে থাকি সুবিমল, তবে

তুমি জীবনে কাউকে ভালবাসনি। তোমার মাকে না, সীতাদিকে না। ভালবেসেছ তাঁদের অসুখকে। অসুখকে ভালবাসাও তোমার একটা অসুখ, তুমি নিজেও জান না। আজও আমার এই রোগটাই তোমাকে টানছে। এটুকু গেলে তোমাকে ভোলাবার মত আমার কী থাকবে।'

সুবিমল তবু হয়ত বাধা দিয়ে কী বলতে চাইবে। তখনও অত্যন্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মাথা নাড়বে সুজাতা।—'তা হয় না, সুবিমল তা হয় না। রুগ্ন সীতাদির কাছে নীরোগ, স্বাস্থ্যবতী সুজাতা একবার হার মেনেছে। আরেকবার তার নিজের কাছে, রুগ্ন সুজাতার কাছে, হার মানতে সে রাজি হবে না।'

নাটক নয়, নাটকের মহলা মাত্র। সত্যি হলে সুজাতা কি সুবিমলকে এমন কঠিন আঘাত করতে পারত। আসলে ভীরু বলেই ত না-প্রকাশ্যে, না-গোপনে, কালকে ডেকে জেনে নিতে সাহসই হল না, দূর থেকে যাকে ভাসাভাসা দেখেছে, কে সেই মেল নার্সটি। সাত দিন পরে যখন সুজাতা লোকাল ট্রেনে কলকাতা ফিরে চলেছে, তখনও নিজেকে বলেছে, ভালই হয়েছে, শেষ অবধি জানা হয়নি, কে। হয়ত সুবিমল, হয়ত সুবিমল নয়। সারা জীবন কত দেখলুম, জানলুম, শিখলুম। জেনেই বা কী লাভ হল। একটি জিজ্ঞাসা না হয় চিরদিনের মত নিরুত্তর থেকেই গেল।

বিস্রপান

এই মাত্র তোমার সীতা মাসির শেষ কাজ সেরে বাসায় ফিরলাম লিলি, রাত এখন ন'টা। খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা নেই, ওখানেই ওরা জোর করে ঠাণ্ডা এক গ্লাস সরবৎ খাইয়ে দিয়েছিল। ফিরেই তোমাকে চিঠি লিখতে বসা, অদ্ভুত খেয়াল, না? রাত এখন ন'টা, ঘড়ি না দেখেই লিখতে পারছি, কেন না কুল্পী আর তপসে মাছ একটু আগেই হেঁকে গেছে, ওদের সময় একেবারে নট নড়ন-চড়ন, বাঁধা। তোমার সীতা মাসির অসুখের সময় টের পেয়েছি; ওর জ্বর নেওয়া, ওষুধ খাওয়ানোর সময় আমি ওদের ডাক শুনেই ঠিক করে নিতুম; রিস্টওয়াচটা বাঁধা দেবার পর থেকেই। বেলফুলওয়ালা এইমাত্র গলিতে এল। আজ ওর গলা কেমন যেন ঝিমোন, একটু বসে-যাওয়া মতন, বোধ হয় সারা সন্ধ্যা বিক্রী সুবিধের হয় নি। ভাবছি ওকে ডেকে এক ছড়া মালা কিনে নিলে কেমন হয়, শুধু লোকে কী মনে করবে ভেবেই সাহস পাচ্ছিনে। এইমাত্র বৌকে পুড়িয়ে এসে লোকটা কিনা বেলফুল কিনতে বসল! বিশেষ করে আমি ডরাই ওদিকের ফ্লাটের গিন্নীকে, আমার কাজের উপর নজর রাখার জন্যে যিনি নিজেকে বিনি মাইনেয় বহাল করেছেন। একটা চোখ তাঁর এ দিকের দরজার ফোকরেই থাকে, অনুমান করি এখনও আছে, অভিজ্ঞতাটুকু তিনি দুপুরে পাড়া-সমিতির রিপোর্টের কাজে রঙ ফলিয়ে কাজে লাগান। কবে রাত ক'টায় ফিরেছি ট্যাক্সিতে না রিক্‌শায়, সিঁড়িতে হোঁচট খেয়েছি কি খাই নি, প্যাসেজের আলো না জ্বেলেই কি নিজের দরজার ফোকরে চাবি গলাতে পেরেছিলাম, না কি তোমার সীতা মাসিকে রাত দুপুরে ডাকাডাকি করে তুলতে হয়েছিল, ও-বাড়ীর গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করো, একেবারে বিশ্বস্তসূত্র বিবরণ পাবে।

লম্বা ঘোমটাটানা আমার টেবিল-আলোটি একেবারে লজ্জাবতী

কলাবৌ, তাকে জানালার উপরে বসিয়ে দিয়ে লিখতে বসেছি। বড় দেয়াল-আলোটার নিচে বসি নি এই জন্যে যে, ওখান থেকে বিছানাটা সামনাসামনি পড়ে। বিছানায় কেউ নেই, কিন্তু আজ বিকাল অবধিও ছিল। তোমার সীতা মাসি ওখানে এক মাস চাদর, বালিশ, তোশকের সঙ্গে মিশে ছিল। খাটটা এখন খালি, কেমন নিরাবরণ লাগছে, আমি ভীতু নই, ভাবপ্রবণও নই তুমি জান, তবু চোখে পড়তেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে! সেই ছমছম ভাবটা চাপা দিতেই এই চিঠি লেখার কাজটা হাতে নিয়েছি কি না, মনোকূটনৈতিকেরা বলতে পারবেন। তবে এ-ও তো ঠিক, তোমাকে চিঠি লেখা তেমন কিছু জরুরী ছিল না। তাসের আড্ডাতে যেতে পারতুম, সময় কাটানোর আরও দু' চারটে জায়গা যে না চিনি তা নয়, আর কিছু না হোক, শেষ শো-এর সিনেমা তো ছিল। যাই নি, যেতে পারিনি, শুধু লোকনিন্দার ভয়ে নয়, যদিও সেটা একটা কারণ, আসলে মনই টানে নি। শ্মশানের কাজ ফুরোতে আর কিছু ভাল লাগল না, কারো সঙ্গে না, চিতাধুম আমার নির্বিকার চিত্তেও কিছু ঔদাস্যসৃষ্টি করে থাকবে, তার অদৃশ্য নির্দেশে সোজা ফিরে এসেছি বাড়িতে, বন্ধুরা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, আসতে দিইনি। তবু কিছুটা সময় থাকতে ভাল লাগবে।

জানি না লিলি, চিঠিটা এতদূর পড়বার আগেই তুমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছ কি না, অনুমান করছি দাও নি, দিলেও আমি জানব না, কিন্তু তুমি ঠকবে লিলি, তোমার জীবনের একটা বড় ঘটনার ব্যাখ্যা তোমার কাছে চিরকালের জন্য অজ্ঞাত থেকে যাবে। হয়ত বলবে, তাতে তোমার কিছু আসে-যায় না, সে অধ্যায়টির উপরে ত কবেই যবনিকা পড়ে গেছে! কিন্তু অত্যন্ত অবিচার করা হবে তার প্রতি, এই মাত্র যার নশ্বর শরীরের সামান্য যেটুকু কালরোগ তিলে তিলে খাবার পরও বেঁচেছিল, সেটুকুও আগুনে

আহুতি দিয়ে কলসী-কলসী জল ঢেলে ধুইয়ে দিয়ে এলাম। তোমার সীতা মাসি একেবারেই শেষ হয়ে গেছে, সে আর এই পৃথিবীতে আমাদের আলো-হাওয়ার শরিক নয়।

এই চিঠি লেখাটাকেই তুমি বেয়াদপি মনে করছ, ভাবছ নির্লজ্জ লোকটার সাহস ত কম নয়! যা অনেক দিন চুকে গেছে এই অছিলায় আবার তার জের টানতে চায়। বেশ কল্পনা করতে পারি, তোমার ভ্রূর দু'টি প্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে নাকের ঠিক উপরটাতে মিলেছে, দাঁতে নিচের ঠোঁটের কোণ চেপে ধরেছ, চোখের পাতা দপদপ করে পড়ছে, যেমন বরাবর পড়ত, রাগ, অভিমান, উত্তেজনার সময় তোমার এই চেহারা অনেকবার দেখেছি। পরে দেখেছি তোমার সীতা মাসিরও পড়ে, তোমাদের দু'জনের বাইরের অনেক মিলের মধ্যে এটাও একটা। যাই হোক, বিশেষ অনুরোধ, চিঠিটা শেষ অবধি পড়ো, বিশ্বাস কর, আমার আর কোন অভিপ্রায় নেই, ছেঁড়া সুতো আবার জোড়া দিতে চাইনে, যা ফুরোয়, তাকে ফুরোতে দেবার মত বাস্তব বিচারবোধ আমার আছে। আমি শুধু সীতার কাছে আমার অপরাধের বোঝা হালকা করতে চাইছি। মানুষটাই যদি গেল, তবে তার বোঝা বয়ে কী লাভ? এটা আমার শেষ করণীয়গুলির অন্যতমও বটে। সমাজের চোখে আমার চেয়ে আপন তার কেউ ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়েছে তোমাকে। একদিন তুমিও ত তার সবচেয়ে আপন ছিলে। তারপর ঘটনাচক্রে তার চেয়ে বেশি ঘৃণাও তুমি কাউকে কর নি। সেই ঘৃণাটুকু নিয়েই সে শেষ পর্যন্ত গেছে।

তোমাকে আজ লিখছি লিলি, তোমার সীতা মাসির বড় সাধ ছিল, সব আলো নিবে যাওয়ার আগে তোমাকে একটি বার চোখে দেখার। আরও অনেক সাধের মতো এটিও তার শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে। অসুখের গোড়ার দিকে ত কিছু বলে নি, চুপ করে উপর দিকে চেয়ে কী ভাবত! তখনও বোঝেনি শেষ এত কাছে।

নানা চিকিৎসা সত্ত্বেও যখন উঠতে পারল না, ডাক্তাররা ঠিক মত ধরতেই পারলেন না অসুখটা কী, তখন হয়ত বুঝেছিল এই তার শেষ বারের মতো বিছানা নেওয়া। তখন থেকেই কেমন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ছোট একটা আয়না ত শিয়রেই-থাকত, সেটাকে নিয়ে বারে বারে চোখের পাতা টেনে দেখত, কতটুকু রক্ত আছে। কারও সাড়া পেলেই আয়নাটা লুকিয়ে ফেলত বালিশের নিচে। যেদিন জ্বর খুব বেশি উঠত সেদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার কথা তুলত। তুমি যখন খুব ছোট, তখন কবে কী করেছিলে, কবে লুকিয়ে আচার খেতে গিয়ে···সে সব কথা উঠলে সহজে থামত না। কোন কোন দিন সোজাসুজি ওকে বলেছি, লিলিকে খবর দিই একটা ? ওর চোখে একটুখানি লোভ জ্বলে উঠতে দেখেছি, মনে হয়েছে দুর্বল বাসনাটুকুর কাছে এই বুঝি ধরা দেবে। কিন্তু কঠিন প্রয়াসে সীতা নিজেকে সম্বরণ করেছে। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বলেছে, না, থাক। কী হবে, কী বলব ওকে ?

আসলে বলবার কথা ত কতই ছিল ! কিন্তু বলা সহজ ছিল না। সব কথা খোলাখুলি বলতে গেলে আমার নামটা ধুলোয় মিশিয়ে দিতে হত যে। অতদূর যেতে সীতা পারত না। তুমি জান না লিলি, শেষের দিকে সে হয়ত আমাকেও একটু ভালবাসতে শুরু করেছিল।

তুমি পড়ে জ্বলে যাচ্ছ। ভাবছ এ আবার কোন-দেশি ন্যাকামি। ভালবাসতে শুরু করেছিল কী রকম, সেত ভালবেসেই আপনাকে বিয়ে করেছিল ! এখন অন্তত জেনে রাখ লিলি, তুমি খাঁটি খবরটা জানতে না।

শেষের সাত দিন সীতার জ্ঞান ছিল না। সারাদিন নিঝুম হয়ে পড়ে থাকত, মাঝে মাঝে ভুল বকত। বিকারের ঘোরে কত বার যে তোমার নাম বলেছে ! লোক মারফত তোমাকে শেষে খবর পাঠিয়েছিলুম। কিন্তু তুমি ত এলে না। হয় ত অসুখের কথাটা

বিশ্বাস কর নি, করলেও মনে কর নি সেটা এত গুরুতর। সব জেনেও আসনি এ-কথা টের পেলে তোমার সীতা মাসির মৃত্যুকষ্ট আরও বেশী হত। তোমার অভিমান আর দুর্জয় ঘৃণাই শেষ পর্যন্ত দু'জনের মধ্যে আড়াল হয়ে রইল।

দেখ ভূমিকাটাই কত বড় হয়ে পড়ল, এখনও আসল কথায় আসতেই পারলুম না। কী জান, লেখা-টেখা, বিশেষত গুছিয়ে কিছু বলা, আমার ঠিক আসে না। সে কথা অবশ্য লেখা বাহুল্য। আমার দু'চারখানা চিঠি, অন্ধ বিদ্বেষে সব যদি পুড়িয়ে না ফেলে থাক, এখনও তোমার কাছে আছে। তখনই ত প্রমাণ পেয়েছ যে, ভাষা দূরে থাক আমার বানানও সব শুদ্ধ হয় না। এ সব ঘাটতি ত আছেই, আজকে তার উপরে জড়ো হয়েছে আমার ভীরুতা। তুমি এতদিনে কতটুকু জেনেছ জানি না, কিন্তু নিজের সম্পর্কে চরম স্বীকারোক্তি করতে বসেও আমার বাধছে। সোজা কথাটি লিখতে পারছি না, কেবল ঝোপের আশে-পাশে লাঠি-পেটা করে হয়রান হয়ে পড়ছি।

মাঝখানে একটুখানি খালি জায়গা পড়ে আছে দেখছ, তার মানে এর মধ্যে উঠে এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়েছি। বাইরের খোলা ছাতে খানিকক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়া চোখে-মুখে লাগিয়ে ফের বসেছি লিখতে। আমার চিঠির খসড়া এতক্ষণে মোটামুটি ঠিক হল।

ভাবছি, চিঠিটাকে দু'ভাগে ভাগ করব। প্রথম ভাগে যা থাকবে তার অনেকখানিই তুমি জান, আর দ্বিতীয় ভাগের সামান্যই।

তোমার বোধ হয় মনে নেই লিলি, আজ থেকে ঠিক দশ দিন কম চার বছর আগে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। দিনটি আমার বিশেষ করে মনে আছে, সেদিন থেকেই আমার জীবনে বিপর্যয়ের শুরু কি না! তার আগে অবধি জীবন আমার কাছে মধুর বায়ে রঙ্গে ভেসে যাওয়ার বেশি কিছু ছিল না। এক একটি দিন কাটিয়ে দেওয়া যেন টিন থেকে একটি একটি করে সিগারেট

তুলে, দেশলাই ছুঁইয়ে ফুঁ দিয়ে ফুরিয়ে দেওয়া ; কিম্বা দু'টোর মধ্যে তফাত যদি থাকে তবে ধাপের, জাতের নয়।

তুমি ঠিক করে বল ত লিলি, আমার কোন জিনিসটা তোমাকে সে দিন টেনেছিল? ভ্যারাইটি শো'য়ের পর তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেবার ভার যেচে নিয়েছিলুম, তিন ঘণ্টার প্রোগ্রামে তোমারই তিনটে নাচ ; পিছনের সীটে যখন বসলে, তখন ক্লান্তিতে তোমার চোখ দু'টি আধবোঁজা, ভাল করে হয়ত আমাকে লক্ষ্য কর নি। হয়ত ভেবেছ, আমি উদ্যোক্তাদেরই কারুর মাইনে-করা শোফার। তবু ট্রাফিকের জটাজাল ভেদ করে অনায়াসে গাড়িখানা বের করে নেওয়া ; অসতর্ক একজন পথচারীকে চাপা দিতে দিতেও শেষ অবধি কৌশলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, এসব তুমি অলস অবসন্ন দেহ-মন নিয়েও দেখে এবং মনে মনে তারিফ করে থাকতে পার। নইলে বাসার সামনে নামিয়ে দেওয়ার পর তুমি নমস্কার করলে কেন? মাইনে-করা শোফারকে কি কেউ নমস্কার করে? ইতিমধ্যে টিন থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরিয়েছিলাম, তাও অবশ্য তোমার চোখে পড়ে থাকতে পারে। মোট কথা, পরে তুমি আমার কাছে স্বীকার করেছ, সে-দিন একটু ধাঁধা নিয়েই তুমি গাড়ি থেকে নেমেছিলে। এ নিয়ে তখন যে বেশী ভাবতে পার নি তার কারণ নাচের সাকসেস তখনও তোমার অবশ চৈতন্যে নেশার মতো জড়িয়ে আছে। ক'বার হাত-তালি পেয়েছ সেই কথা বলে সীতা মাসিকে অবাক করে দেওয়া তখনও যে বাকী আছে!

আমার কপালেও সে দিন যে সকলই শূন্য হল, ভুলেও ভেব না। তোমার বাসা দেখে নিয়েছি, তারও আগে জেনে নিয়েছিলুম তুমি কোন কলেজে পড়, কোন ইয়ারে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সেদিন শিস দিয়েছি, গ্যারেজে গাড়ি তোলার আগে মোড়ের দোকান থেকে মিঠে পান আর লেমোনেড খেয়েছি। সুপুরি খেলেই আমার মাথা ঘোরে, সেদিনও ঘুরেছিল। হোটেলে ফিরেও অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারি নি। মগজমাকড়সা একটার পর একটা জাল বুনে গেছে।

তিন দিন পরে কলেজের গেট থেকে বিকালে বেরিয়ে তুমি ভিড়ের জন্যে বাসে উঠতে পারনি। বই-খাতা বুকের কাছে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলে। তখন ধীর-গতি একটি গাড়ি বিপরীত দিক থেকে এসে হঠাৎ তোমার সমুখে দাঁড়াল। তার চালক এবং একমাত্র আরোহীকে তুমি প্রথমে চিনতে পার নি। লোকটি গাড়ি থেকে নেমে তোমাকে দেখে অবাক গলায় বলেছে, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে?

তুমি বলেছ, আপনি?

পরিচয় দিয়ে বিনয়ের ভান করে বলেছি, আপনার অবশ্য আমাকে মনে থাকবার কথা নয়। সে দিন বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলুম, কিন্তু সে ত মিনিট দশেকের ব্যাপার। তা' ছাড়া সে দিন পুরনো ডজখানা নিয়ে এসেছিলুম, আজকেরটার রঙ, মেক, সব আলাদা। মানুষটা কিন্তু বদলায় নি, ভাল করে চেয়ে দেখুন।

এবারে চিনতে পেরে লজ্জা পেয়েছ। বার বার ক্ষমা চেয়েছ।

গাড়ির দরজা খুলে বলেছি, যদি অনুমতি করেন—

সঙ্কোচে বলেছ, না না, কতটুকু বা পথ, বাসে জায়গা না পাই ত আমি হেঁটেও যেতে পারব। উপরোধে পড়ে শেষ অবধি আমার প্রস্তাবে রাজি হতে হয়েছে।

তুমি হয়ত ভেবেছিলে দেখা-হওয়াটা হঠাৎ। আমি যে বিকেল চারটে থেকে গাড়ি নিয়ে মোড়ে দাঁড়িয়েছিলুম ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ কর নি। যেমন সন্দেহ কর নি সে-দিনকার ডজ বা আজকের প্লীমাথ, কোনটাই আমার নয়। আমি যে একটা মোটর রিপেয়ার ওয়ার্কশপে কাজ করি, সেটা জানতে তোমার বেশ কিছুদিন লেগেছিল, এবং জেনেও আমাকে কিছু বল নি, সবটাই চেপে গিয়েছিলে, কেন না তত দিনে তুমি অনেক দূর এগিয়ে গেছ, কিম্বা সঠিক বলতে গেলে আমরা দু'জনে মিলে এগিয়েছি।

আজ হয়ত সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলে তুমি জোরে জোরে মাথা নাড়বে লিলি, বলবে, না, না, কিন্তু নিজেকে একবার একান্তে জিজ্ঞাসা কর ত, আমার পরিপাটি পোশাক, ওলটানো চুল, নিখুঁত আলাপ

করবার নিপুণতা, এসব তোমাকে মুগ্ধ করেছিল কি না। বেচারা অলক তোমার সঙ্গে তার আগে কম দিন ধরে ত মেশেনি, কিন্তু তাকে নির্মম ভাবে ছেঁটে দিতে তোমার ক'দিন লেগেছে? বোধ হয় এক মাসও না। শেষ দিনের কথা ত আমার স্পষ্ট মনে আছে, নাটকটা আমার সমুখেই অভিনীত হল কি না। অলক দু'খানা সিনেমার টিকিট কেটে এনেছিল, তাকে বুঝি কথাও দিয়েছিলে, যাবে। জানতে না, সে-দিনও আমি সদর রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঘন ঘন হর্ন দেব। বারাকপুর যাবার প্রোগ্রাম। লম্বা ড্রাইভ, যাবে? সম্মোহিতের মত বলেছ, যাব।

অলক সেদিন আমার সমুখেই সিনেমার টিকিট দু'টো কুচিকুচি করে ছিঁড়ে চলে গেছে।

পরে বোধ হয় সে-ই তোমাকে আমার মোটর মেকানিক পরিচয়টা দেয়। আগেই বলেছি, দিয়েও কিছু সুবিধে করতে পারে নি, কেন না, ততদিনে তুমি মজেছ। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কপিবুকের লেখার মতো রুলটানা পথে এগিয়েছে। শিবপুরে পিকনিক; ডায়মণ্ডহারবারে গাড়ি নিয়ে পাড়ি; ভাল রেস্তোরাঁর নিরালা কোণে বসে চা, ইত্যাদি, যা-কিছু হয়ে থাকে। মোটের উপর তখন আর ফেরার পথ ছিল না, এমন কি আমার পক্ষেও না। যদিও এখন তোমাকে জানাতে বাধা নেই, এসব ব্যাপারে সেই আমার হাতেখড়ি নয়। বন্ধুরা ইতিমধ্যেই হাসাহাসি করে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে শুরু করেছে, 'বেঁচে এলেম অনেক যুদ্ধ করি, আজকে বুঝি জানে-প্রাণে মরি।'

এর পর লাইটহাউসের ম্যাটিনি শোয়েতে তুমি এক দিন এলে হাফটাইমেরও পরে। অন্ধকারে মুখ দেখতে পাই নি, কিন্তু গলা শুনেই মনে হয়েছিল তুমি যেন কিছু ভীত, হয়ত বা উত্তেজিত। দেরির কারণ জানতে চাইলে ফিসফিস করে বলেছ, সীতা মাসি সব জানতে পেরেছে। আজ আসতে দিতে চাইছিল না। কোন রকমে পালিয়ে এসেছি।

কে সীতা মাসি জিজ্ঞাসা করতে হয় নি। আগেই এক দিন দূর থেকে তাঁকে তুমি দেখিয়ে দিয়েছিলে। তোমার আপন মাসি, গিরধরীলাল হাসপাতালের লেডি ডাক্তার। তিরিশেও কুমারী। তোমার মার মৃত্যুর পর তোমাকে নিজের মেয়ের মত কাছে টেনে নিয়েছেন, তাঁর আশ্রয়েই তুমি আছ।

আরও নানা কথার ফাঁকে আভাস পেয়েছিলুম তুমি তাঁকে যতটা ভালবাস ততটাই ভয় কর। শুনে শুনে আমিও বুঝি তাঁকে মনে মনে ভয় পেতে শুরু করেছিলুম। না করে উপায় কী বল? মোটাসোটা মধ্যবয়সী ময়লা মেয়েমানুষটি যখন ভারি হাতব্যাগটা নিয়ে থপ থপ করে পথ চলতেন, তাঁর সেই ভারিক্কী চালকে সমীহ করে সরে না দাঁড়িয়েছে এমন অসম সাহস কার?

সিনেমা শেষ হতে বাইরে এসে বলেছ, তোমাকে এতবার করে বলছি সীতা মাসির সঙ্গে দেখা কর, সব কথা বল, তা তোমার ফুরসতই হয় না।

—ভরসা পাইনে যে।

—কেন, মাসি কি বাঘ না ভালুক? তোমার যত বাজে ভয়। আমাকে এত ভালবাসেন। আমি যাতে সুখী হব তাতে উনি কিছুতেই বাধা দেবেন না, জোর গলায় বলতে পারি। শুধু এই লুকোচুরিটা ভাল চোখে দেখছেন না।

অবশেষে দেখা করলুম তোমার সীতা মাসির সঙ্গে পরদিন দুপুরে। উনি খেতে এসেছিলেন, তুমি তখন কলেজে। পরিচয় দিলুম। ভাবলেশহীন মুখে আমার সব কথা শুনলেন; সব শেষে একটিমাত্র কথা সেদিন বলেছিলেন, আমি ত আপনাকে জানি। কিছু খবর নিয়েছি, আরও কিছু নিতে হবে। সে-সব ধীরে-সুস্থে হবে। তাড়া কী? লিলি ত এখনও ছেলেমানুষ। ওর এখনও বুদ্ধি পরিণত হয় নি। নিজের ভাল-মন্দ বোঝে না। আজ একে ভাল লাগে, কাল ওকে। এই ত, ক'দিন আগেও ওকে অন্য রকম দেখেছি হঠাৎ আপনি এলেন, মেয়ের মন একেবারে ঘুরে গেল।

তুমিই আমাকে পরে বলেছ লিলি, এর পর তোমার সীতা মাসি কয়েকদিন ধরে তোমাকে শুধু বুঝিয়েছেন।—এ বিয়ে তুই করিস নে লিলি, আমি বলছি, তুই সুখী হবি নে।

ভয়, সঙ্কোচ সবই ছিল, মাথা নিচু করে বলেছ, কেন?

—তুই ছেলেমানুষ, সব কথা তোকে বলা যায় না। আমি তোর মায়ের মতো, এইটুকু জেনে রাখ। যা বলছি তোর ভালর জন্যেই।

বিশ্বাস কর নি, চোখ দু'টো নিচের দিকে রেখে কেবলই মাথা নেড়েছ।

—তোর বয়স এখনও কম, পড়াশুনা করছিস, কর। আগে ভাল ভাবে পাশটাশ কর—

এক দিন লজ্জাটুকু বিসর্জন দিয়ে তেতো গলায় বলেছ, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি মাসি, তুমি চাও না আমার বিয়ে হোক।

আমার কাছে পরে বলেছ, বুঝি, বুঝি, হিংসে, সব হিংসে। নিজে ওই চেহারা আর মেজাজের জন্যে ঘর পান নি, বর পান নি, আমাকেও চিরকুমারী বানিয়ে রাখতে চান। পাশ করে ধুমসী লেডি ডাক্তার হয়ে আমিও ওঁর মতো ধাইগিরি করি তাই ত ইচ্ছে? তা হবে না, আমিও আজ ওঁকে সোজাসুজি বলে দিয়েছি, বিয়ে আমি করবই। তোমাকেই করব।

তোমার মনের যা জোর লিলি, হয়ত শেষ অবধি তাই করতে, যদি না সেই দৃশ্যটি হঠাৎ তোমার চোখে পড়ে সব বদলে দিত।

তোমার খোঁজেই সেদিন দুপুরে তোমাদের বাসায় গিয়েছিলুম। সে সময়ে তোমার সীতা মাসির বাসায় থাকবার কথা নয়। অথচ দরজায় টোকা দিতে তিনিই বেরিয়ে এলেন। ফিরে যাব কি যাব না ভাবছি, মধুর গলা কানে এল, অসুন না, ভেতরে আসুন। লিলি এখনও কলেজ থেকে ফেরে নি, তবে এখুনি ফিরবে। সময় হয়ে গেছে। এসে বসুন।

কণ্ঠস্বরের মধুরতা এবং আহ্বান, দুই-ই অপ্রত্যাশিত। সীতা

সেদিন আমাকে একেবারে তোমাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ভিজে খোলা চুল, সদ্য পান খাওয়ার পরে ফিকে লাল ঠোঁট ওঁর ভারিক্কী চেহারাকেও কেমন কমনীয় করেছে। পাখাটা খুলে দিলেন। ড্রেসিং আয়নার সামনে ছোট একটা টুল ছিল, তবু ধবধবে চাদর-পাতা পরিপাটি বিছানাটারই একধারে বললেন বসতে।

—হাসপাতালে যান নি? একটা কিছু নিয়ে নেহাত আলাপ শুরু করবার জন্যেই বলেছিলুম, মনে আছে।

সীতা মাসি একটা হাই তুললেন।—না, কই আর গেলাম। শরীরটা খারাপ, আজ আর যাব না ভাবছি। হাইটা দেখিয়ে দেখিয়ে এবং কিছুটা শুনিয়ে তুলেছিলেন, ওঁর মুখবিবরের অনেকটাই চোখে পড়ল, মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে চাইলাম।

—গরম হাওয়া আসছে বুঝি? দরজাটা ভেজিয়ে দিই? বলে সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই সীতা উঠে গেছেন, আঁচল লুটিয়ে পড়েছে, অন্তর্বাসহীন ভেজা জামার ভেতর দিয়ে পিঠের মসৃণ ত্বকটুকুও দেখতে পেয়েছি। কবাট দু'টো ঠেলে সীতা তেমনি আঁচল লুটিয়ে ফিরে এসে বিছানাতেই বসেছেন। আমার সম্মুখে বসেই বইয়ের মলাটের কোণা দিয়ে গলার যেখানে শেষ এবং বুকের সীমানা শুরু, সেখানকার ঘামাচি মারলেন। তার পরে আর একটা এবং অতঃপর আরও একটা। সীমান্ত বুঝি লঙ্ঘন হয়-হয়, আমি ক্রমাগত ঘামছি, বার বার চাইছি দরজার দিকে, কতক্ষণে তুমি কলেজ থেকে ফিরবে, আমাকে বাঁচাবে। ঘড়ি দেখতে শুরু করেছিলুম, আর দু' মিনিটের মধ্যে যদি তোমার পায়ের সাড়া না-ও পাই, তবু উঠে পড়ব ঠিক করেছিলুম।

উঠে পড়তামও ঠিক, যদি তখনই তোমার সীতা মাসির ফিট না হত। সীলিঙের দিকে চেয়ে সেকেণ্ড গুনছি, হঠাৎ কোলের উপরে ভারি একখানা হাত পড়তে চমকে উঠলুম। চেয়ে দেখি, সীতা শুয়ে পড়েছেন আমারই কোল ঘেঁষে, চোখের তারা কেমন দৃষ্টিহীন, দু'পাটি দাঁত লেগে গেছে, বার কতক বুকটা তোলপাড় করে থেমে

গেল, ঝুঁকে পড়ে দেখি, ওঁর সারা শরীর অনড়, শিথিল। এমন বিপদে জীবনে পড়িনি। ভূতে-ঢেলা-মারা দুপুর, ডাকাডাকি করে কোন ঝি বা চাকরের সাড়া পেলুম না।

এ-সব ব্যাপারে আমি একদম আনাড়ি, বয়স্কা কুমারী মেয়েদের অনেকের ফিটের অসুখ থাকে শুনেছিলুম, সীতারও যে আছে, জানতুম না। লোকের মুখে-শোনা পদ্ধতিরই দু-একটা সাধ্যমত প্রয়োগ করতে হল। পাখাটা চালিয়ে দিলুম পুরো বেগে, কুঁজো থেকে জল ঢেলে ঢেলে চোখে-মুখে ঝাপ্‌টা দিলুম। থর থর হাতে বুকের জামার বোতামও আলগা করে দিতে হয়েছিল। চুল, গলা, কান চুইয়ে জল গড়িয়ে বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজে গেছে, জামাটারও উপরের দিকটা শুকনো নেই, শিয়রে আনাড়ি আমি কাঠ হয়ে বসে আছি, লিলি, আমার অবস্থা তুমি শুধু বারেক কল্পনা কর। মিনিটের পর মিনিট কাটছে, উদগ্রীব হয়ে একটি অসাড় শরীরের দিকে তাকিয়ে আছি। এক সময় মনে হল, তলপেট থেকে বুক অবধি সীতার শরীরটা যেন নড়ে উঠল, চোখের নিমীলিত পাতা দু'টিও কাঁপছে। হাতের কঠিন মুঠি আমার কোলের উপরেই শিথিল হয়ে এল। ধীরে ধীরে ওঁকে চোখ মেলতেও দেখলুম, মণি দু'টি তখনও নিষ্প্রভ। একটা প্রবল দ্রুত শ্বাস পায়ের আঙ্গুলের ডগা থেকে সঞ্চারিত হয়ে জানু, কটি, বুক, গলা পার হয়ে মাথার চুল অবধি সমস্ত শরীরটা যেন দুলিয়ে দিয়ে গেল, শিউরে উঠে সীতা তাড়াতাড়ি উঠে বসতে গেলেন, পারলেন না, ভিজে চুলসুদ্ধ মাথাটা আমার কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ল।

ঠিক এই সময়েই বোধ হয় তুমি কলেজ থেকে ফিরেছিলে লিলি। ভেজানো কবাটের ফাঁক দিয়ে এইটুকু মোটে দেখেছিলে। আর দাঁড়াও নি, তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছ। আমি, বিহ্বল, বিমূঢ় বসে আছি, একবার মনে হয়েছিল বটে যে, কে-যেন এসে ফিরে গেল। সীতার মাথা তখন আমার কোলে, সন্তর্পণে নামিয়ে বাইরে গিয়ে যখন উঁকি দিলাম, কাউকে দেখতে পাই নি।

রাত এখন ঠিক ক'টা অনুমান করতে পারছি নে লিলি, হয়ত একটা, হয়ত দু'টো। শেষ সিনেমার সওয়ারি নিয়ে ঠুংঠুং রিক্‌শাগুলো অনেকক্ষণ উধাও হয়েছে। সারাদিন হৈ-চৈ করে হয়রান সদর সড়কটা এখন গোপালের মতন নিতান্ত সুবোধ বালক। ঘুমিয়ে কাদা, সাত চড়েও রা কাড়বে না। জানালা দিয়ে হাওয়ার একটা প্রবল ঝাপ্‌টা এসে আমার কলাবৌ টেবিল-আলোটার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে গেল। কৃষ্ণা-তৃতীয়ার চাঁদ কখন টুপ করে মাঝ আকাশে ডুবে গেছে, জ্বলজ্বলে তারাগুলো সেই অপমৃত্যুর সাক্ষী। ঠিক এই সময়ে বস্তুজ্ঞান কেমন এলোমেলো হয়ে যায়, অলস চেতনা অদ্ভুত সব কল্পনা করে বসে। মনে হয় তারাগুলো যেন তারা নয়, আকাশের দেহে এই শহরটারই তেজী আর চড়া আলোগুলোর ছায়া পড়েছে। সমস্ত উত্তর দিকটা একটি কালো মেঘ ধীরে ধীরে ছেয়ে ফেলছে। মাথা তুলে দেখছি একটি তারা মিটমিটে চোখে চেয়ে আছে আমার দিকে। তারার এমন মিটমিটে চোখ কেন ? অথবা কে জানে, হয়ত মিটমিটে নয়, যোজন যোজন শূন্যতা পাড়ি দিতে গিয়ে আলোকণিকাদের বুক কেঁপে যায়।

এ সব দুরূহ, অর্থহীন সমস্যা তোলা থাকুক, ঝড়-জল এসে পড়ার আগে বাকীটুকু শেষ করে নিই। প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেছে, এবার শেষ পর্ব। এর অল্পই তুমি জান।

পরদিন সকালে সীতা আমার বাসায় এসেছিলেন, একেবারে রাতকাপড়ে, মুখ-চোখেও বুঝি জল দেননি। দু'টি চোখের কোণেই রক্তের ছোপ। বললেন, লিলি এখানে নেই ?

প্রশ্নটা ভাল করে বুঝিনি। তবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছি, লিলি এখানে ?

ওখানেই, প্রায় ধুলোর ওপরেই, বসে পড়েছিলেন সীতা। পূর্ব দিনের ফিটের অভিজ্ঞতা ছিল, পাছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাড়াতাড়ি তাই ওঁকে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। দু'হাতে মুখ ঢেকে সীতা জড়িত গলায় কয়েকটি কথা বলে গেলেন, সবগুলো ঠিক

কানে গেল না, এইটুকু মাত্র বুঝলুম, কাল থেকে তুমি বাসায় ফেরনি।

সীতা তখন আর বসেন নি, যেমন এসেছিলেন, তেমনি হঠাৎ বেরিয়ে গেলেন।

বিকালে তোমার খোঁজে ও-বাসায় গিয়েছিলুম। সীতাকে বাইরের ঘরেই পাওয়া গেল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার শুধু মাথা নাড়লেন,—না। লিলি এখনও ফেরেনি।

—তবে ত পুলিশে খবর দিতে হয়।

—পুলিশ? সীতা এবারেও মাথা নাড়লেন;—না। তার দরকার নেই বিলাসবাবু। সে চিঠি দিয়েছে। এই দেখুন।

চিঠি পড়া শেষ হতে ওঁর মুখের দিকে চাইলুম। বিবর্ণ মুখে সীতা বললেন, ও কাল কলেজ থেকে তবে ফিরেছিল। কী সব ওর চোখে নাকি পড়ে গেছে। ও আমাকে এখন ঘৃণা করে। এক পিসীমার বাসায় গিয়ে উঠেছে। আর ফিরবে না।

—আর ফিরবে না। আমাকে ঘৃণা করে। পুনরাবৃত্তি করলেন সীতা, সহসা তাঁর বয়সের পক্ষে বেমানান গলায় খিল-খিল করে হেসে উঠলেন।—আমি কামনাপরবশ, নীচ লোলুপ আরও কী সব যেন লিখেছে? তেমনি হাসতে থাকলেন সীতা, মিনিটের পর মিনিট, থামাতে গিয়ে আমি ওঁর দু'হাত শক্ত করে ধরলুম, ঝাঁকুনি দিতে বুঝি চৈতন্য হল, আমার হাতখানা টেনে নিয়ে মৃদু একটা চাপ দিলেন, তন্দ্রালস গলায় বললেন, আপনি এবারে যান বিলাসবাবু, আমি একটু ঘুমোব। কাল আবার আসবেন কিন্তু। লিলি আমাকে ছেড়ে গেছে, আপনিও যেন ছাড়বেন না।

মধ্যবয়সী, হিস্‌টিরিয়াগ্রস্ত, আপন বলতে যার কেউ নেই, কোন দিন হবেও না, সেই মহিলাটির জন্য সেদিন করুণা হয়েছিল।

তার পরদিনও গিয়েছিলুম। শেষে রোজই যেতুম।

তোমার মনে আছে লিলি, সে সময়ে তুমি ধিক্কার দিয়ে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছিলে? আপনার মেয়ের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে

খেতে যার বাধে না, সেই ইতর স্ত্রীলোকটিকে তুমি তবু বুঝতে পার লিখেছিলে, পার না শুধু আমাকে। আমি কী দেখে আধবয়সী একটা হতশ্রী বুড়িকে নিয়ে ছি-ছি, লিখেছিলে, তুমি সরে এসেছ বটে, কিন্তু পরাজয় মেনে নাও নি, এই বিকৃত নেশা আর ক'দিন। একদিন আমার চৈতন্য হবে, আমি যাব তোমার কাছে, ততদিন তুমি অপেক্ষা করবে।

সে-চিঠি কী করে তোমার সীতা মাসির হাতে পড়েছিল। পড়ে মুখভঙ্গি কঠিন হয়ে গেছে, সীতা সেদিন একটা অবিশ্বাস্য কীর্তি করেছেন। রোমশ-পরুষ ছ'খানি হাত টের পাই নি কখন আমাকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরেছে, লালিত্য এবং শ্রীহীন একটি মুখ আমার কানে কানে ভিখারির গলায় বলেছে, না তুমি ফিরে যাবে না, যাবে না ওর কাছে। ওর সব আছে, সব হবে। আমার কী আছে বল ত, কী নিয়ে বাঁচব! তুমি কৃপা কর, আমাকে কৃপা কর।

গায়ে কাঁটা দিয়েছে, তবু ফাঁসের মতো গলায় জড়ানো হাত ছ'খানি সরিয়ে দিতে পারি নি।

তোমার হিসাব আছে কি না জানিনে, ঠিক পনের দিন পরে তোমার সীতা মাসি আর আমি বিয়ে-রেজেস্টারি অফিসে গিয়ে নাম সই করে আসি।

এবার সেই ভয়ঙ্কর বাসর-রাত্রিটির কথায় আসি লিলি, যে কথা আমি আর সীতা ছাড়া আজ অবধি কেউ জানে না। আর জানবে তুমি, যদি এ চিঠি এতদূর পর্যন্ত পড়ে থাক।

হাঁ এ বিয়ের বাসর হয়েছিল বই কি, বর্ষার সন্ধ্যায় বন্ধুদের ছোট একটা পার্টি দিয়েছিলুম। তারা কিছু কিছু উপহারও এনেছিল। বিছানায় ছড়িয়ে দিয়েছিল ফুল, কে যেন ঠাট্টা করে একটা গোটা আতরের শিশিই বালিশে উপুড় করে ঢেলে দিয়েছিল।

তবু সে বিছানায় শুতে পারি নি, খাটের এক দিকে আমি,

আরেক দিকে তোমার সীতা মাসি সারা রাত অপলক চোখে পরস্পরকে দেখেছি ; সাপ আর নেউলের কথা পড় নি, কেউ নড়ে না, পাছে একজন একটু অসতর্ক হলেই আরেক জন ঝাঁপিয়ে পড়ে? ঠিক যেন তাই।

অথচ ঠিক এমনটি হবার ত কথা ছিল না। ন'টার আগেই অতিথিরা সবাই চলে গিয়েছিল। ওরা বিছানায় ছড়িয়ে দিয়ে গেছে উগ্রগন্ধ ফুল, জ্বালিয়ে দিয়েছে ধূপ, বড় ডুমটার সুইচ নিবিয়ে, ছোট নীল আলোটা জ্বেলে দিয়ে খল খল হেসে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেছে। একটু মোহ তখন লেগেছিল বই কি চোখে। সেই নীল নিরিবিলি ঘরে অন্তত তখন মনে হয়নি, এ বিয়ে ঠিক স্বাভাবিক ধরনের নয়। মাঝবয়সী ডাক্তারনি হোক আর যাই হোক, তোমার সীতা মাসিকে টকটকে লাল শাড়িটায়, স্বল্পালোক মদিরসুরভিত ঘরে কনে বৌ'টির মতোই কিন্তু লাগছিল। পাশের ছাতের নিচু টিনের শেডে শ্রাবণ নটিনীর চটুল নূপুর একটানা বেজে চলেছে, বন্ধুদের চাপা আদিরসিকতাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে রক্তকণিকায়, নিভৃত ঘরে আমি পুরুষ আর দ্বিতীয় জন রমণী, বিবশ চেতনায় এ-ছাড়া কিছু ছিল না।

শোনা, পড়া এবং মামুলী রীতিতে ওকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিতে গিয়েছিলুম। ঠিক তখনই প্রথম ছোবলটা পড়ল। অগ্রসর হাতটা ঠেলে দিয়ে একেবারে ধার ঘেঁষে বসল সীতা। ঘোমটা সামান্য সরে গেছে, ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, কঠিন গলায় একটু বা বিদ্রূপের ছোঁয়া দিয়ে বলল, থাক। প্রয়োজন নেই।

তখনও বুঝিনি। জানতাম মেয়েরা অমন একটু আধটু বাধা দিয়েই থাকে, ওদের সহজাত হাজারো ছলাকলার এ-ও একটি। সলতের মত দপদপ কামনা জ্বলছে আমার চোখের কোণে, রগে-রগে রক্তকণা যেন ফেটে ফেটে চৌচির হয়ে আরও রক্তাক্ত হয়ে উঠছে, নিজেকে সম্বরণ করা তখন আমার সাধ্যের বাইরে। প্রবল টানে ওকে বুকের ওপর টেনে এনেছি, বাসনাপীড়িত ঠোঁট দু'টি

নিয়ে ঝুঁকে পড়েছি, ভেবেছি আমার অস্থির আবেগের চাপে আরেকটি দেহ নিরস্থি নরম হয়ে যাবেই, কিন্তু গেল না ত'। প্রবল-তর বেগে সীতা আমাকে ঠেলে দিয়েছে, কোন মতে খাটের পায়া ধরে সামলে নিয়েছি।

ওর বিস্ফারিত চোখ দু'টি দিয়ে ঘৃণা ঝরছে, পাতা থরথর, সেই একই উত্তেজনা, কঠিন গলা আবার শুনছি, তুমি তবু বারে বারে সেই একই ভুল করছ বিলাসবাবু, এ সবের জন্য আমি বিয়ে করি নি। আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কেবল লৌকিক, নইলে আমাদের দু'জনের কেউ কারও-নই।

—কেউ কারও নই? বিমূঢ় গলায় বলেছি,—কী বলছ সীতা।

নিষ্প্রাণ স্বরে সীতা বলে গেছে, ঠিক বলেছি। আজকের এই ধূপ, এই মালা, এই ফুল মিথ্যে।

—মিথ্যে?

মুখের একটি রেখাও সরে নি, শেষ রায় দেবার ভঙ্গিতে সীতা আবার বলেছে, মিথ্যে। যেমন মিথ্যে তোমার ভদ্রলোকের খোলস, চকচকে পালিশ। বিলাস বাবু, তুমি ত সত্যিই ভদ্রলোক নও। আমি কি জানিনা ভেবেছ, তোমার শিক্ষা মেকি, মিষ্টি-মিষ্টি হাসি ফাঁকি, সহজে মেয়ে ধরবার ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। না, চমকে উঠো না, অবাক হয়ো না। তোমার সম্পর্কে সব খবর নিয়েছি, সব। মোটর ওয়ার্কশপে সামান্য মিস্ত্রিগিরি করতে, সে চাকরিও তোমার এখন নেই, পার্টস চুরি করার দায়ে গেছে। চুরি করা টাকাও খুইয়েছ, রেসের মাঠে। কী রোগ সারাতে ডাক্তার সোমের কাছে ইঞ্জেকশনের কোর্স নিতে এখনও প্রতি সপ্তাহে দু'দিন করে যাও, তাও কিছু কিছু জানি বৈকি।

একটানা ঝড়ের বেগে বলে গেছে সীতা, ওঝার মন্ত্রপড়া সাপের মতো মাথা তুলতে পারি নি। জানি না লিলি, তখন তোমার সীতা মাসির মনে ক্ষণিকের জন্যে একটু করুণার উদয় হয়েছিল কি না। খানিক থেমে সে আবার বলেছে, তুমি একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে

গেছ বিলাস, খালি ঘামছ। আজ যে কথা হল এ কিন্তু শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যে, ভয় নেই, যে জন্যে আমাকে বিয়ে করেছ সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। আমার টাকার ওপরে লোভ ছিল ত, সে তুমি পাবে। সেখানে তোমাকে বঞ্চনা করব না। এটুকু দাম আমি দেব। কেন না, আমি যা চেয়েছিলাম তাও ত পেয়েছি।

আর চুপ করে থাকতে পারি নি, রুদ্ধস্বরে বলেছি, কী তুমি চেয়েছিলে, কী পেয়েছ ?

দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছে সীতা, শান্ত সমাহিত দু'চোখের দৃষ্টি সুদূর ; বলেছে, লিলিকে বাঁচিয়েছি।

আমার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর প্রায় চীৎকারের মতো শুনিয়েছে, লিলিকে বাঁচাতে তুমি আমাকে বিয়ে করেছ সীতা ?

অদ্ভুত ভঙ্গিতে সে একটু হেসেছে। আমার আর কতটুকু ক্ষতি হল বল ? এতকাল বিয়ে হয় নি, আর কেই-ই বা করত। ধরে নেব আমি এখনও-কুমারী। সর্বনাশের হাত থেকে একটা কচি মেয়েকে ত বাঁচালুম।

লিলি, সঙ্গে সঙ্গে চকিতে বুঝেছি, সেই ফিটের দিনের ঘটনা থেকে সব-কিছুই সাজানো। তোমার সীতা মাসি অভিনয় করে গেছে।

তোমাকে যেটুকু জানানোর দরকার ছিল তার এখানেই শেষ। তোমার সীতা মাসি যদি শেষ পর্যন্ত তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারত, তবে গল্পও এখানে শেষ হতে পারত। কিন্তু তা ত হয়নি, তারপর তিন বছরের বেশি কেটে গেছে। ট্রাজেডি কোথায় জান, সে টলেছিল, আমাকে একটু ভালও বাসতে শুরু করেছিল। আর ভালবাসতে গিয়েই বুঝি মরল। আমার শরীরের বিষ ছড়িয়ে গেল তার দেহে, আমার পাপের কি কোন যোগ্য সাজা আছে ? সেই ব্যাধিরই নানা জের আর জটিলতায় দীর্ঘকাল ভোগার পর অবশেষে আজ তার সব জ্বালা জুড়িয়েছে। ডাক্তারি অভিধানে এ রোগের যে নামই থাকুক লিলি, আমি একে অপঘাতই বলব।

জোরে হাওয়া বইছে, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটায় চিঠির কাগজ ভিজে গেল। রাত ফুরোতেও বুঝি আর বাকী নেই। শরীরটার সুখ নিয়েই সারা জীবন এত ব্যস্ত থেকেছি, অশরীরী সত্তার কথা ভাববার অবসর পাই নি, বায়ুভূত নিরাশ্রয় অস্তিত্বে কোন দিন বিশ্বাস করিনে। তবু আজ থেকে-থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে, খালি বিছানাটার দিকে চাইতে ভরসা পাইনে। কেবলই ভুল হয়, ভাবি ওখানে কেউ এখনও শুয়ে আছে, এখুনি বুঝি পাশ ফিরবে সে, শীর্ণ হাত বাড়িয়ে জল চাইবে। জেনে শুনে যে বিষ খেয়েছিল লিলি, তাকে এই তিন বছর ধরে ত শুধু ঘৃণা করেই এসেছ। যদি পার, এবার একটু ভালবেসো।

প্রেমপত্র

কনক, আমি সুধাময়। তোমাকে যে ভালবেসেছিল। এবং যার ভালবাসার ভয়ে তুমি এখন দূরে গিয়ে পালিয়ে রয়েছ।

এ-লেখাটা শেষ পর্যন্ত তোমাকে হয়ত পাঠাব না, পাঠাতে সাহস হলেও রুচি হবে না, তবু লিখছি। এই ভরসায় যে, কিছু হালকা হওয়া যাবে। নিজের নামটা আগেভাগে লিখে রাখলুম, ফলে শেষের পৃষ্ঠাটা তোমাকে প্রথমেই দেখে নিতে হবে না।

মধ্যবয়সী একটা মানুষের ভালবাসাকে ভালুকের মত ভয় পাও, কনক, তুমি কী! একটু যদি ধৈর্য থাকত তোমার, তবে জানতে, সে ভালবাসার নখ-দাঁত কোনটাই নেই। সুতরাং পালাবার প্রয়োজন ছিল না।

এখন তুমি ত অনেক দূরে কনক, সত্যি করে বল ত, তোমাদের জানালা থেকে আমাকে যখন দেখতে, তখন তোমার মনে ঠিক কী ভাব জাগত। মাথার দখল নিয়ে লড়াই করে কাঁচা আর পাকা দু তরফের চুলই যার সাফ হয়ে এসেছে, সেই লোকটি টেবিলে বসে ঝিমোত, গালে তার তিন দিনের বাসী দাড়ি, ঢিলে লুঙ্গিতে কষে-বাঁধা কোমর। লোকটি কলম খুলে কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকত। মাঝে মাঝে লিখত। কী, জান? মানে-নেই এমন টুকিটাকি। ছাতের কার্নিশে বসে একটা কাক কাকিনীটার ঘাড়ের রেঁায়া ঠুকরে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, আর একটা অবাক কাঠবিড়ালী একটু দূর থেকে তাই তারিফ করছে, লোকটি তার খাতায় এই জরুরী খবরটি টুকে রাখল। কিংবা কোনদিন দুপুরের দাউদাউ রাগের পরে বদ্ধপাগল আকাশটা হঠাৎ শোর-গোল করে হয়ত কান্না জুড়ে দিয়েছে, লোকটি তখন লেখা ফেলে পিছনের পানাপুকুরে বৃষ্টির খই ফুটছে কিনা দেখতে দৌড়ল।

এ-সব কোন কাজে লাগে না, না-কাহিনী, না-ডায়েরি, তবে খাপছাড়া লোকটার কথাই আলাদা।

লুকিও না কনক, আমি জানি, তুমি লুকিয়ে দেখতে। কিন্তু তোমার কী মনে হত। কৌতুক? সম্ভব। ভয়? বোধহয় না। তখনও আমাকে ভয় করবার কোন কারণ ঘটেনি। কিন্তু সে যখন কিছুই লিখতে না পেরে কাগজ কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে উড়িয়ে দিত, অস্থির হয়ে এ-দিক ও-দিক চাইত, তখন? করুণা কি হত, কনক? কমবয়সী মেয়েরা কি প্রৌঢ় পাগলামিকে করুণাও করে?

দেখ, কনক, সময়কে যদি বলা যায় বহতা পানি, এক-একটা বয়স তবে তার পাড়ের এক-একটা বাঁধান ঘাট; উজান থেকে মানুষ কতটা এল সে-হিসাব যার সিঁড়িতে খোদাই করা আছে। ভাঁটির ঘাটে দাঁড়িয়ে পিছনে চাইলে উজানের ঘাট বড় জোর ঝাপসাভাবে চোখে পড়বে কিন্তু মানুষ সেখানে কখনও ফেরে না, ফিরতে পারে না।

কেউ যা পারেনি, ভেবেছিলুম আমি তা পারব। জানতুম না, প্রকৃতির নিয়মের উপর জারিজুরি চলে না।

তোমার মনে আছে, কনক, আমার বসবার ঘরের জানালাটার পাশে একদিন বিকালে আমরা দু' জন দাঁড়িয়ে ছিলুম? পর্দা সরিয়ে তুমি কী যেন দেখছিলে। হয়ত রাস্তার ভিড়। কিংবা কিছুই দেখছিলে না, শুধু চেয়ে ছিলে। আমি পিছনে এসে দাঁড়ালুম। তোমার কাঁধে সন্তর্পণে একটি হাতও রেখেছিলুম মনে পড়ছে। স্পর্শকাতর লতার মত তুমি কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলে; সরে যেতে চাইলে।

আমার ইচ্ছাটা যদি নিজেই নিজের বিধি হত, তবে সেই মেঘে-ঢাকা কালামুখী বিকেলে ব্যাপারটা কতদূর গড়াত, বলতে

পারিনে। একটু দূরে গিয়ে তুমি জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছ, আমার দিকে অপলক চেয়ে একটু একটু করে পিছনে হঠছ।

হঠাৎ আমি অস্ফুট গলায় নিজেকে বলে উঠতে শুনলুম, "বন্ধ কর, বন্ধ কর জানালাটা।" বলতে বলতে আমি পাল্লা দুটো নিজেই টেনে ধরলুম। ঠাস-ঠাস চড় পড়ার মত দুটো শব্দ হল। আমি দম নেবার জন্যে একবার চোখ বুঁজেছি, তুমি সেই অবসরে ছুটে পালিয়ে গিয়েছ।

কনক, তুমি আজও জান না, সেদিন আমার কী হয়েছিল। কেন হঠাৎ জানালাটা টেনে বন্ধ করে দিলুম।

আমার স্ত্রী যূথিকা কিন্তু জানত, কেন। বসবার আর শোবার ঘরের মাঝখানে একটাই ত পর্দা, ফ্যানের হাওয়া সেটাকে থেকে থেকে মুঠোর মত পাকিয়ে আবার খুলে দেয়। বিছানায় বালিশের উপর বালিশ সাজিয়ে যূথিকা এ-দিকেই চেয়ে ছিল, সব দেখছিল।

একটু পরে যখন ও-ঘরে গেলুম, সে বালিশের স্তূপে পিঠ ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসল। একটা চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, "কে এসেছিল ?"

তোমার নাম বললুম।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চোখটাকে বন্ধ করে যূথিকা ভাবনার ভান করল। তারপর দু'টো চোখই খুলে বলল, "বুঝেছি। সিনেমায় নামবে বলে ঘোরাঘুরি করছে, পাড়ার সেই খারাপ মেয়েটা, কেমন ? তা হঠাৎ অমন দুদ্দাড় ছুটে পালাল কেন ?"

সব জানে, তবু আমার মুখে শুনতে চায়। বদ্ধ জন্তুকে খোঁচা দেবার বর্বর সুখ।

তিক্ত গলায় বললুম, "জানি না। তুমিই বল না।"

"জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছিলে বলে।"

চমকে উঠলুম। অত্যন্ত কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলুম, "জানালা কেন বন্ধ করলুম, তা-ও জান বোধ হয় ?"

অদ্ভুত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে যূথিকা ধীরে ধীরে বলল, "তা-ও জানি। জানালার ঠিক বাইরে কচি সজনে গাছটার পাশে ন্যাড়া-মরা নিম গাছটাকে দেখে হঠাৎ ভয় পেয়েছিলে।"

অনেক দিন কল্পনা করতে চেষ্টা করেছি, কোন মানুষ যদি হাসতে হাসতে হঠাৎ মরে যায়, তবে তার মুখে কেমন হাসি ফুটে থাকে। চোখের কোল হয়ত একটু কুঁচকে যায়, সামান্য ফাঁক হয় ঠোঁট দু'টি। আর তার কোন নড়চড় কিছুতে হয় না। যূথিকার মুখে সেই স্থির, বোবা হাসি দেখতে পেলুম। কনক, চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে আমি সেদিন যূথিকার চোখের মণি উপড়ে নিতে পারতুম।

আজ বুঝতে পারছি, যূথিকা ঠিকই বলেছিল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সেই খণ্ড-মুহূর্তে সহসা মনে হয়েছিল, মরজন্ম ঘুচে গিয়ে লোকান্তরে আমরা উদ্ভিদ-দেহ পেয়েছি, সবুজ-সজীব সজনের ডালের পাশে ন্যাড়ামরা নিম হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি।

জানালাটা সেদিন থেকে বন্ধই থাকত। তবু কনক, তোমার কাছে আজ অকপটে স্বীকার করছি, মাঝে মাঝে এক একদিন আমি লুকিয়ে জানালাটা খুলতুম। কেন, আমিও জানিনে। মরা নিমের ডালে একটি দুটি কচি পাতা ফুটেছে দেখতে পাব, হয়ত গোপন মনে এই অসম্ভব আশা লালন করেছি। চুয়ান্ন বছরের প্রবীণ শরীর একটি বাতুল ইচ্ছার নড়িকে আশ্রয় করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছে।

এইখানে যূথিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা খোলাখুলি আলোচনা করলে ভাল হয়। উপরে তার যে-ছবিটি এঁকেছি তা থেকে যদি ধারণা কর কনক যে, আমরা বিবাহিত জীবনে সুখী হইনি, তবে ভুল করবে। যদি মনে কর, যূথিকা স্বভাবক্রূর সামান্য রমণী, তবে তার প্রতি অবিচার করা হবে।

আসলে যেদিন যূথিকা হাসপাতাল থেকে দুরারোগ্য অসুখ

নিয়ে ফিরে এল, সেদিন থেকেই এই জটিলতার শুরু। সূতিকায় ত কত শিশুই মরে, কিন্তু তাদের মায়ের দেহ-মনে এমন ছাপ আর কেউ রেখে যায় না। যূথিকা জেনে এসেছিল সে আর কোনদিন মা হবে না। তার চোখের চাউনিই বদলে গিয়েছিল।

প্রথমে দিন কতক বিছানাতেই আয়না চিরুনি, পাউডার আর স্নো নিয়ে পা ছড়িয়ে বসত। মুখ দেখত আর মুখ দেখত। রঙ বুলিয়ে ঠোঁট দু'টি করত টুকটুকে। আঙুল দিয়ে সিঁথি চিরে চিরে পরখ করত ক'টা চুল পাকল। গুনত, ভুল করত, ফের গুনত।

হঠাৎ বা কোনদিন জিজ্ঞাসা করত, "এটা কী সাল বল ত?" শুনে নিয়ে হিসাব করতে বসত।..."এক, দুই, তিন...আমার তবে এখন চলছে চুয়াল্লিশ। না-না, হল না, তেতাল্লিশ। কী জানি, ঠিক গুনতে পারছি না। তুমি একবার বলে দেবে?"

ভয় হত, বয়স গুনে গুনে আর পাকা চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাগল না হয়ে যায়।

এ-ভাবটা মাস তিনেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। একদিন দেখি শিয়র থেকে সরে গেছে আয়না, বালিশ-বিছানার আনাচে-কানাচে থেকে পাউডার কুমকুম ইত্যাদি বিলাসের সব উপচার অন্তর্হিত।

কাছে যেতেই বলল, "উঁহু, এস না, এস না, আগে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে এস।"

বিস্মিত এবং কতকটা বিরক্তও, জিজ্ঞাসা করেছি, "গঙ্গাজল কোথায় পাব।"

"আছে। চাকরকে দিয়ে আজ আনিয়েছি। তুমি আমাকে গীতা এনে দেবে?"

তিন দিনে যূথিকার এক অধ্যায় গীতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ ছিল না. কিন্তু সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে আমাকে তার ব্যাখ্যা করে শোনাতে বসত কিনা, কনক, মুশকিল ছিল সেখানে। এ বিষয়ে আমার উৎসাহের অভাব ত ছিলই কিন্তু প্রকৃত সমস্যা অন্য। যূথিকা যতদূর সম্ভব আমার ছোঁয়াছুঁয়ি

বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করছিল। দৈবাৎ গায়ে গা ঠেকত যদি, সে-পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে গঙ্গাজলের ব্যবস্থা ত ছিলই।

মজা যে একেবারেই পাইনি, তা বলব না কনক। পেয়েছি। প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ও দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

যূথিকা একদিন বলল, "আমি দীক্ষা নেব।"

বললুম, "বেশ ত, নাও না। গুরুটুরু কি পেয়ে গেছ?"

"গুরু আমার ঠিকই আছে। শোন, তিনি বলেছেন তোমাকেও দীক্ষা নিতে হবে।"

"আমাকে? আমাকে আবার কেন। তোমার পুণ্যের একটু ভাগ আমাকে দিয়ো, তবেই বৈতরণী তরে দেখবে স্বর্গে ঠিক তোমার পাশে গিয়ে হাজির হয়েছি।"

বলতে বলতে, কী সর্বনেশে বুদ্ধি হল, ঝুঁকে পড়ে যূথিকাকে বুকের উপরে টেনে নিতে গেলুম। তীব্র একটা গুলির মত ছিটকে গেল যূথিকা, আলুথালু বেশে ভাঙা-চেরা একটা বাঁশির মত গলায় চেঁচিয়ে বলল, "ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে।" মাথায় ঠক করে কী লাগল, তুলে দেখি সেই বাঁধান শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা। যূথিকা হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বলল, "পশু।"

সেই মুহূর্তে আমারও কী জানি কী হল, এই স্ত্রীলোকটির দিকে চেয়ে সমস্ত শরীর রী-রী করে উঠল। সব দিক থেকে নিঃস্ব এই মেয়েমানুষটার কাছে কোনদিন কিছু চাইতে পারব না, চাইলেও দেবার মত কানাকড়ির সম্বলও ওর নেই। শণের-নুড়ি চুল আর শির ওঠা রোগা-রোগা হাত দু'টির দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললুম, "বুড়ি!"

পলকে যূথিকাকে ফ্যাকাশে হয়ে যেতে দেখলুম। "কী, কী বললে?"

কথাটাকে জিভ দিয়ে যেন টাকার মত বাজিয়ে বাজিয়ে বললুম, "বুড়ি। বুড়ি। বুড়ি।"

ভেবেছিলুম, নুয়ে-নেতিয়ে পড়বে। কিন্তু না, ধীরে ধীরে যূথিকা নিজেকে যেন ফিরে পেল। এক-পা এক-পা এগিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল আমার সমুখে। বলল, "বুড়ি? আমি বুড়ি? আর তুমি?"

কী ছিল সেই অপলক চোখে, আমার ভিতরটা অকস্মাৎ কেঁপে উঠল। অত্যন্ত ক্ষীণ, শুকনো গলায় বললুম, "আমি কী।"

আশ্চর্য স্থির এবং প্রশান্ত ভঙ্গিতে যূথিকা বলল, "তুমিও কিছু কালকের খোকাটি নও। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার ছায়াই তোমাকে সে-কথা বলে দিত। আমাকে বলে দিতে হত না।"

কনক, আয়নার দরকার হয়নি, যূথিকার চোখে আমি নিজের ছায়া দেখেছি। সে চেহারা এক ভয়াল তান্ত্রিকের। শবাসনে বসেছে—শব তার নিজেরই শরীর। ইচ্ছা-বাসনা, সুখ-স্বপ্ন সব মটমট করে ভেঙে সামনে জ্বালান ধুনিতে আহূতি দেবে।

তুলনাটা কিছু বীভৎস হয়ে গেল, হয়ত দুর্বোধ্যও। সোজা করে বলি। সেই সময়ে আত্মহত্যার মত কাঁচা-নাটকীয় একটা কাণ্ড করবার প্রবল লোভ মাঝে মাঝে আমাকে বিচলিত করেছে। পাহাড়ে উঠে চারদিকে চেয়ে লোকে যে শূন্যতা অনুভব করে, এ তা-ই। উঠবার পথ খাড়া ছিল, দুর্গম ছিল, কাঁটায় কাঁকরে কষ্টে, রক্তে-যন্ত্রণায় মাখামাখি অভিজ্ঞতা। কিন্তু এখন চূড়ায় উঠেছি, যা কিছু দেখার দেখে নিয়েছি, আর উঠব না, কষ্ট পাব না, কিছু নেব না, শুধু নেমে যাব। আরোহণের পর এই অবরোহণ।

সেই নামেমাত্র বেঁচে থাকাটাকে আমি ভয় করতে শুরু করেছি। স্বাদহীন, স্বেদহীন সেই আলুনী আয়ু নিয়ে আমি কী করব।

কনক, ঠিক এই সময়ে তোমরা এই পাড়ায় উঠে এলে। এক দিন লেখার টেবিলে বসে ফরমাশী ফিল্‌মের স্ক্রিপট লিখছি, রাস্তার ও-পাশের বাড়ির ছাদে তোমাকে দেখতে পেলুম।

দেখ, প্রথম দেখাটাকে আমরা এ-কালে আর তেমন মূল্য দিই না,

হঠাৎ-কোন-কিছুকেই না। সব সম্পর্কই পরম্পরা বেয়ে বেয়ে লতার মত জড়িয়ে ওঠে। তবু সেদিন অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখেছিলুম।

ছাদের কার্নিশে কোন কিছু না ধরে পা ঝুলিয়ে বসে আছ— তোমার সেই দুঃসাহসী কিন্তু অনায়াস ভঙ্গির ছবি আমার মনে একেবারে ছাপা হয়ে গেছে। ভাল লাগল, ভয় পেলাম। তোমার বসবার ভঙ্গিকে ভাল লাগল। বেপরোয়া, সব কিছু তুচ্ছ করবার ভাবকে ভয় পেলাম। ও-ভাবে ছাদে পা ঝুলিয়ে আমিও একদিন বসেছি, এখন শরীর ওজনে ভারি, মনও ভীতু, এখন আর পারি না, কিন্তু তুমি পার, আর সেই পারার অহঙ্কার লুকোবার এতটুকু প্রয়াস তোমার মধ্যে দেখলুম না। সেই ঔদ্ধত্য আমাকে মুগ্ধ করল।

তবু সেই মোহ হয়ত শুদ্ধ, নির্গন্ধ সাদা ফুলের মত অনুভূতি মাত্র হয়ে মনে বেঁচে থাকত, কিন্তু যূথিকা প্রথম থেকেই সন্দেহের নখে আঁচড়ে আঁচড়ে তাকে রক্তাক্ত ঘায়ের মত করে তুলল যে। নইলে, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের যা ব্যবধান, তাতে আমি দিব্য তোমার পিতৃব্য বনে যেতে পারতুম।

প্রথম বোধ হয় পাড়ারই কী একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তোমাকে গান গাইতে শুনি। সেখানে কার মধ্যস্থতায় আমাদের আলাপ হল জানি না, কিন্তু তার দিন কয়েক পরে তুমি নিজেই একদিন আমার বসবার ঘরে চলে এলে। কার কাছে শুনেছ, আমি সিনেমার জন্যে গল্প, চিত্রনাট্য, সংলাপ ইত্যাদি রচনা করে থাকি। স্টুডিও মহলে আমার যাওয়া-আসা আছে। সামান্য পরিচয়ের ভরসায় জানতে এসেছ, আমি কিছু সুবিধা করে দিতে পারি কি না।

পারি না, কিন্তু তোমাকে সেদিন কথাটা খোলাখুলি বলতে অহঙ্কারে বেধেছিল। আশাও দিইনি। একেবারে নিরাশও করিনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি অবাক হয়ে তোমাকে শুধু দেখেছি। সেই সবে পরিচয়, তবু তোমার এতটুকু আড়ষ্টতা নেই। এই একবার বসলে, এই উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। মাথায়

সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে কথা বলতে গিয়ে খোঁপা একবার আলগা হয়ে পড়ল, পিছনে দু'হাত নিয়ে কনুই তুলে ফের সেটাকে বিন্যস্ত করলে। সামান্য একটা কথাতেই কৌতুক পেয়ে হঠাৎ হালকা গলায় হেসে উঠেছ। সেটাও ঈষৎ বিস্ময়কর, কিন্তু তখন অসঙ্গত বা বেমানান মনে হয়নি।

গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসে ছিলুম বটে, কিন্তু কনক, সেই মুখোশের ছিদ্র দিয়ে আমি তোমাকে অপলক দেখছিলুম। ঠিক তোমাকে কি? না, তোমার চাপল্যকে। যে-চাপল্য আমি ইহ-জন্মের মত খুইয়েছি, আর পাব না, তাকেই তুমি তোমার শাড়ি-ব্লাউজের মত, তোমার চোখের ক্ষীণ সুর্মা-রেখার মত, অসামান্য রুচির সঙ্গে পরে আছ।

যূথিকা সেদিনই টের পেয়েছিল; হেসে বলেছিল, "ও-মেয়েটা তোমার কাছে কেন এসেছিল, সিনেমায় নামতে চায় বুঝি?"

সংক্ষেপে বলেছি, "হ্যাঁ।"

যূথিকা তবু থামেনি, গলায় নকল গাম্ভীর্যের ঢঙ এনে বলেছিল, "সাধু সাবধান।"

"মানে?"

"নিজেই বুঝে দেখ।"

তীব্র কণ্ঠে বলেছি, "আমার বোঝা আছে। তুমি দয়া করে তোমার ছোট মন আর খুঁতখুঁতে নাক নিয়ে এ-সব ব্যাপারে এস না।"

"না। আমার আর কী। আমার বিছানার চার পাশে ত তুমি ওষুধের শিশির পাহাড় জমিয়ে রেখেছ, তার লেবেল পড়ে-পড়েই আমার দিন কাটবে। কিন্তু আমি হাসছি তোমার কথা ভেবে। ও-মেয়ের চোখের দিকে চেয়েছ, দেখেছ, মণি দুটো না-সাদা, না-বাদামী, কী অদ্ভুত রঙের? এ-সব মেয়ে সর্বনেশে হয়, জেনে রেখ।"

কনক, সেদিন যূথিকার কথায় চটেছি। কিন্তু পাড়ায় তোমার

সত্যিই ত সুনাম ছিল না। ওই ক'দিনেই তোমার নামে অনেক খবর কানে এসেছে, কিছু চোখেও পড়েছে। তোমার হাবভাব ভাল না, তুমি পুরুষের সঙ্গে বড় বেশী মেশ, এমন কি, সদর রাস্তায় প্রকাশ্যেই লোকের সঙ্গে সহাস্য নির্লজ্জ গল্প জুড়ে দাও। এর সঙ্গে দুপুরে হয়ত বের হও রিকশায়, ওর সঙ্গে সন্ধ্যায় ট্যাকসিতে। অনেক দিন গভীর রাত অবধিও ফেরনি, হলপ করে এমন কথা বলবারও লোক ছিল।

আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে যূথিকা কোথা থেকে কীভাবে জানি না, সব খবরই জোগাড় করত।

প্রথম দিকে তিন-চারদিন পর-পর আসতে, পরে প্রায় রোজই আমাদের বাসায় আসা শুরু করলে। জানতে, কোন সময়ে আমাকে বাসায় পাওয়া যায়। যূথিকার সঙ্গেও আলাপ করে নিলে। রোজ তার ঘরেও একবার যেতে, তার কোমরের ব্যথা আর ঘাড়-ফোলাটা কেমন আছে খোঁজ নিতে। যূথিকা সামনাসামনি তোমাকে কিছু বলত না, কিন্তু মনে মনে জ্বলত, জ্বলত, জ্বলত। আড়ালে যে-সব খারাপ গালাগাল মুখে আনত, শুনলে কনক, তুমি কানে আঙুল দেবে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে, কথায় বিষ-ফোঁড়ন দিয়ে বলত, "মেয়েটাকে সিনেমার কাজ এখনও জুটিয়ে দিতে পারলে না বুঝি? তা বাপু আমি বলি কী, ওসব সিনেমা-টিনেমা বাড়ির বাইরে হলেই ত ভাল। বাড়িতে কি ওসব কেউ করে?" বলতে বলতে হাসত যূথিকা, "দেখ, একটা মজার কথা মনে পড়ল। আমার এক দাদামশাইয়েরও এ-সব রোগ ছিল। থিয়েটারের কার কাছে তিনি রোজ যেতেন। কিন্তু মনে রেখ, যেতেন, তাকে বাড়িতে এনে তোলেননি। সেকালের লোকেরাও তোমাদের মত খারাপ ছিল, কিন্তু ভদ্র ছিল। বাড়ি আর বাগান-বাড়ির তফাত বুঝত। তোমরা দু'টোকে এক করে দিতে চাও।"

জবাব দিতে হলে অত্যন্ত কুৎসিত ঝগড়ার ডুবজল পাঁকে নামতে

হয়। অতএব কনক, আমি অধিকাংশ দিনই চুপ করে সরে এসেছি।

এসেও ত পরিত্রাণ পেলাম না।

যূথিকা সেই জানালা বন্ধ করে দেবার ঘটনার চারদিন পরে বিশ্রী রকমের ঠাট্টাটা করল। এই চারদিন তুমি আসনি। অথচ তুমি এখানেই ছিলে। একদিন বিকালে ত মুখোমুখি পড়ে গেলুম। পাড়ার যুবসঙ্ঘের পাণ্ডা গোছের একটি ছেলের সঙ্গে তুমি রিকশায় উঠছ। আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। মাথার চুল ফাঁপান ধূসর শাড়ির আঁচল অন্যমনস্ক, পাশের ছেলেটির সঙ্গে আরও জোরে জোরে হেসে হেসে কথা বলেছ।

কনক, সেদিন আমারও মনে হয়েছিল, তুমি সত্যিই বড় খারাপ মেয়ে।

বাড়ি ফিরে কোন কাজে মন দিতে পারিনি। চড়া আলোটা নিভিয়ে নিষ্প্রভ-নীল ডুমটা জ্বেলে শুয়ে পড়েছি। ও-পাশের খাট থেকে যূথিকা বলেছে, "কী হল।"

শুকনো এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছি। "মাথা ধরেছে।"

"তবে বালিশ-টালিশ সরিয়ে বিছানাটা একটু ঠিকঠাক করে নাও?"

আধো-অন্ধকারে দেখিনি, ও মুখ টিপে হাসছিল।

বালিশ সরাতে গিয়ে বিষাক্ত বিছের কামড় খেলাম। যন্ত্রণায় গলা অবধি নীল হয়ে এল। কোনমতে বললুম, "এ-সব কী। কে এনেছে, কে রেখেছে এ-সব এখানে?"

অত্যন্ত ভাল মানুষের ভঙ্গিতে যূথিকা বলেছিল, "কোন সব?"

"এই যে কলপ, আর সালসার শিশি?"

নিষ্ঠুর নির্বিকার গলায় যূথিকাকে উত্তর দিতে শুনেছি, "আমি। আমিই বাজার থেকে আনিয়েছি।"

"কেন?" মাথার যন্ত্রণার কথা ভুলে গিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে যেন ফেটে পড়লুম। বললুম, "কেন, কেন, কেন।"

ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে যূথিকা ফিসফিস করে বলল, "শ্-শ্-শ্। আস্তে। তোমার সুবিধার জন্যেই। আজকাল আর আসে না, দেখি ত সেজন্যে ঘরময় পায়চারি কর, মাথার চুল ছেঁড়। আসল কথা কী জান? তোমার বয়সকে তুমি ভুলেছ, কিন্তু বয়স তোমাকে ভোলেনি।"

চমকে চাইলুম। একটু দূরেই থরে থরে শিশি-বোতল সাজিয়ে ছোট খাটটার সঙ্গে যূথিকার বি-শ্রী একদা-নারী শরীর মিশে আছে। অস্পষ্ট আলোয় সেদিকে চেয়ে মনে হল, যেন যূথিকা নয়, যেন আমার ভয়ের বয়সটা ছদ্মবেশ নিয়ে আমাকে উপহাস করছে।

কলপ আর সালসার শিশিটা ছুঁড়ে শব্দ করে চুরমার করবার লোভ অতি কষ্টে সংবরণ করেছি। কারণ আমি ভীরু, প্রৌঢ়, সামাজিক মানুষ। এক সঙ্গে তিন ধাপ করে সিঁড়ি টপকানর মত সব রকম আতিশয্যই এ-বয়সে বারণ।

কনক, তুমি আমার চোখে কামনার হিস-হিস চেরা-জিভকে নড়ে উঠতে দেখেছ, কিন্তু তার আড়ালে পরম-কাপুরুষ সামাজিক মানুষটিকে দেখতে পাওনি। পেলে অন্তত পালাতে না।

সত্যি কথা, সেদিন. অনেক রাত অবধি সদর রাস্তায় তোমার জন্যে পায়চারি করেছি। তোমাকে নামিয়ে দিয়ে একটা গাড়ি পলকে অদৃশ্য হল, তুমি সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে বাসায় ঢুকতে যাবে, আমি তোমার পথ আড়াল করে দাঁড়ালুম। বললুম, "একবার আমার সঙ্গে একটু আসবে কনক? কয়েকটা কথা ছিল।"

চমকে ভয়ে-ভয়ে বললে, "কোথায়?"

"পার্কে, কিংবা···ধর, কোন চায়ের দোকানে?" এলোমেলো জবাব, হয়ত সেই জন্যেই তোমার সন্দেহ হল। একটু পিছিয়ে গিয়ে বললে, "না-না। আজ থাক। অনেক রাত হয়ে গেছে।" উপর দিকে আকাশে চেয়ে যেন তারাদের সাক্ষী মানলে।

হঠাৎ তোমার কবজিটা চেপে বললুম, "এসই না। বেশীক্ষণের জন্যে ত না। আমার কথাগুলো যে খুব জরুরী।"

অনায়াসে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে, দ্রুত পাশ কাটিয়ে চৌকাঠে পা রেখে ফিরে বললে, "আজ নয়। কাল সকালে আসবেন। আর, আর, দেখুন—"তোমার গলা এখানে একটু কেঁপেছে, "দেখুন, আমাকে যত খারাপ ভাবছেন, আমি ঠিক ততটাই খারাপ নই।"

বেত-খাওয়া জন্তুর মত মাথা হেঁট করে ফিরে এসেছি।

কনক, আজ তোমার কথাটা তোমাকেই ফিরিয়ে দিই। যতটা ভেবেছিলে, আমিও ঠিক ততটাই খারাপ নই।

মিছিমিছি সেদিন ভয় পেলে কেন। পেলে যদি, এত কেন, যে-ভয় হিতাহিত জ্ঞানহীন করে? অন্যথা পাড়ার রকের মুরুব্বী অপদার্থ ছোকরাটার সঙ্গে সাতদিনের মধ্যে পালানর মত ভুল তুমি করতে না। এ-কথা আমি পরে বারবার ভেবে সুখ এবং দুঃখ পেয়েছি যে, ভালবেসে নয়, আমার হাত এড়াতেই তুমি চূড়ান্ত দামে একটা লোকশান কিনেছ।

পাড়ায় অবশ্য তোমার পলায়ন নিয়ে অনেক মুখরোচক গুজব তৈরি এবং ফিরি হয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল, তোমার মাতৃত্ব আসন্ন।

তোমার কারণ তুমি জান, আমার তরফ থেকে একটা কথা তোমাকে খোলাখুলি জানাতে চাই। সেদিন সন্ধ্যাবেলা যত চাঞ্চল্যই দেখিয়ে থাকি না কেন, আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, সব রকমের বাড়াবাড়িকেই ভয় করে থাকি। বেশী দূর এগোতাম না। এক, ইচ্ছা ছিল না। দুই, সাধ্যও না।

আজ কবুল-জবাব দেবার নেশায় পেয়েছে, নইলে সাধ্যের কথাটা লিখতে কলম সরত না।

যূথিকাকে একদিন বুড়ি বলে গাল দিয়েছিলুম, মনে আছে? যে-দিন সে আমাকে আয়নায় মুখ দেখতে বলেছিল?

ও বিছানা নেবার প্রায় এক বছর পরের কথা। একদিন আমার চোখকান-ঢাকা নীতিবোধের টুপিটা বিকালের হাওয়ায় উড়ে গেল। সন্ধ্যার ঘোর লাগতে বেরিয়ে পড়েছিলুম সেই সুখের সন্ধানে, যা পণ্য। সন্ধান পেয়েছি, কিন্তু সংগ্রহ করতে পারিনি। শুধু গান শুনে আর, আর পান করে ফিরে আসতে হয়েছে। বোবা, বিবাস ইচ্ছাটা শরীর-চেতনায় কিছুতে ধরা দেয়নি। যূথিকার সালসার শিশির ঠাট্টাটা সাধে কি সহ্য করতে পারিনি।

শ্রাবণের মেঘ যেমন আকাশ ছেয়ে এবং প্রবল জ্বর শরীরের রক্তকণা ছেয়ে আসে, মৃত্যুর সাধও তেমনই আমাকে সেদিন পেয়ে বসেছিল। কোন কাজে মন ছিল না। ভাবিনি সেই নিরাশা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাঁড়াশির চাপ কোনদিন আবার শিথিল হবে।

হয়েছিল। সামান্য ক'দিনের জন্য, কিন্তু হয়েছিল।

পরিবর্তনটা যূথিকার চালাক চোখে ধরা পড়েছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই এক ধরনের আমোদ-পাওয়া হাসি হাসত। মুখে কিছু বলত না, কিন্তু চোখের পাতা কখনও ঠোঁটের কাজ করে। সেই হাসির মানে আমি পড়তে পারতুম। যূথিকা যেন বলত, ব্যাপার কী। আগে ঠেলে-ঠুলে নড়ান যেত না, এখন যে বড় চটপটে ভাব। সময় মত নাওয়া-খাওয়া। লেখার প্যাডে ধুলো জমছিল, হঠাৎ তিন-তিনটে স্ক্রিপটের খসড়া তৈরি হয়ে গেল।

চোখের পাতা দপদপ কাঁপত, যূথিকা যেন বলত, জানি জানি, এত উৎসাহের ইড়া, পিঙ্গলায় কে বসে আছে জানি।

প্রায় বছর ঘুরতে চলল, কনক, এখনও তোমার খোঁজ পাইনি। তোমার বাড়ির লোকেরা সন্তাপে, লজ্জায় এ-পাড়া ছেড়ে গেছেন। শুনেছি তাঁরা তোমাকে হিসাব থেকে খারিজ করে দিয়েছেন। পুলিশ-কেস করবার মত মূল্যও তাঁরা তোমাকে দিতে রাজী নন।

একটি পাথরের নুড়ি কয়েকটি জল-বলয় তুলে ডুবে গিয়েছে, পুকুর শান্ত, স্থির।

কিন্তু একটি হৃদয় এখনও শান্ত হয়নি।

উপসংহারে তার একটা অত্যন্ত ছেলেমানুষী সাধের কথা শোন। সব গিয়েছে, তবু এখনও মাঝে মাঝে এই সাধের সহকারে একটি প্রিয় কল্পনার লতাকে জড়িয়ে দিই। কী কল্পনা, জান ?

একবার, জীবনে আর মাত্র একটিবারই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে তোমার বাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়াব, টোকা দেব। না, দেখা হতে তোমার মুখ কঠিন হবে না। ম্লান হেসে বলবে, "ও, আপনি ?"

ম্লান হাসি, কনক, কেননা চারদিকে চোখ বুলিয়ে ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছি যে, তুমিও সুখে নেই। অনেক উচ্চাশা ছিল যার মনে, অনেক প্রাণের ফেনা যার চোখের কোণ দিয়ে উছলে পড়ত, এই হতশ্রী পরিবেশের হট্টগোলে তাকে চেনা শক্ত হবে।

"খুব রোগা হয়ে গিয়েছ।"

অপ্রতিভ হয়ে বলবে, "হাঁ, বড় একটা অসুখ থেকে উঠলাম। টাইফয়েড হয়েছিল। দেখছেন না চুলের হাল ? সব উঠে গেছে।"

জানি, অত্যন্ত অনুচিত কল্পনা, একান্তই হীন। তবু এই বিষাক্ত লালা দিয়ে মন-মাকড়শা তার জাল বুনে চলে, ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি, সে-সাধ্য নেই।

একটি কর্কশ কান্নার শব্দকে অনুসরণ করে লিকলিকে রোগা এক শিশুকে দেখতে পাব।

জিজ্ঞাসা করব, "এরও অসুখ ?"

মাথা নিচু করে বলবে, "হ্যাঁ। জন্ম থেকেই রিকেট।"

"—চিকিৎসা ?"

এবার জবাব দেবে না, এবং দেবে না বলেই অকস্মাৎ টের

পাব, যার সঙ্গে ঘর ছেড়ে এসেছিলে, সে সরে পড়েছে। তুমি একা।

কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে যাব, কিন্তু ফিরেও আসব খানিক পরে। ঘোরাঘুরি করে ফল আর টনিক ওষুধ কিনে এনেছি।

সেগুলো হাতে তুলে নিতে তোমার চোখ ছলছল হবে।

পরদিন আবার ফিরব। তারও পরদিন আবার।

বাস্তবে হয়ত সম্ভব হত না, কিন্তু সবটাই যখন কল্পনা, তখন একদিন তোমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে কিছু টাকা দিতে বাধা নেই। তোমার কুণ্ঠা দেখে বলব, "না-না, দান নয়, ধার। একটা কাজ পেয়ে শোধ দিও।"

কাজ? বিষণ্ণ উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে বলবে, "কাজ কোথায় পাব।"

অভয় দিয়ে বলব, "নিশ্চয়ই পাবে। তোমাকে এতদিন বলিনি, একটা ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে ছোট একটা পার্ট তোমাকে দেবে বলে কথা প্রায় পাকা করে এনেছি।"

বিশ্বাস করতে সাহস পাবে না, অথচ চোখ দেখে বুঝতে পারছি ত, বিশ্বাস করতে পারলে তুমি বেঁচে যাও। হয়ত সেই টানাপোড়েনে তোমার চোখে জল এসে যাবে। হঠাৎ আমার হাত দু'টি চেপে ধরার মত ছেলেমানুষী করে ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলবে, "আপনাকে আমি কিছুই দিইনি, তবু···"

কনক, তখন? যে-কথাটি বলবার জন্যে কল্পনার এই আয়োজন, তার এক বর্ণও কি সেই গদ্‌গদ্‌ মুহূর্তে মুখে ফুটবে? হয়ত বলতেই পারব না, কী পেয়েছি, কতখানি। বেঁচে থাকার অভিরুচি তুমি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছ। জেনেছি, এখনও তবে আমি ভালবাসতে পারি। আমার যৌবন যায়নি।

মুখ ফুটে বলতে যদি পারি, অবাক হয়ে তাকাবে।—"যায়নি?"

"না।"

দেহগত তুচ্ছ একটা পটুতা নয়, ভালবাসা পাওয়াও না, শুধুমাত্র ভালবাসতে পারাই যে যৌবন, এ-বয়সে এ-কথা বোঝা তোমার পক্ষে শক্ত হবে। তবু লিখে রাখলুম, এই ভরসায় যে, কোনদিন হয়ত বুঝবে। কেননা, কনক, তোমারও ত এই বয়সের অবসান আছে।

কান্নার মানে

অন্যান্য দিনের সঙ্গে এই দিনটির শুরুতে অন্তত কোন তফাত ছিল না।

ভোরটা ছিল বোবা-বোবা, ভিজে-মতন, যে ভোরে জানালার তিন হাত দূরের চেনা শিউলি গাছটাও অনেক দূরে সরে গিয়ে, কুয়াশার আড়ালে অচেনা একটু ভয়ের মত ঝাপ্‌সা হয়ে জমে থাকে।

কুয়াশা কাছের জিনিসকে দূরে ঠেলে দেয়, অপার্থিব, রহস্যগুণ্ঠিত করে তোলে। আর, দূরের জিনিসকে একেবারে লেপে মুছে, নিরাকার-মিছে করে দেয়।

সেদিনও দিয়েছিল।

গলির আলো নিবেছে, পাশের বস্তিতে চৌকিদার-মোরগটা চেঁচিয়ে উঠেছে। পাঁচটা। গায়ে আরেকটু কাঁথা জড়িয়ে শোওয়া যাক। ও-পাশের ফ্ল্যাটে নতুন আমদানী ভাড়াটের ঘরে আলো জ্বলে উঠল, বিয়ের উমেদার আধ-বুড়ী কুমারী মেয়েটার এখনই তারস্বরে সার্গমবাজি শুরু হবে : সাড়ে পাঁচ। গোটা তিনেক হাঁস প্যাঁক প্যাঁক করে পিছনের ডোবাটায় গিয়ে নামল। সারারাত ধরে নির্জলা-উপোসী কলতলাটার বুক সুতো-সরু জলের ছোঁয়ায় তিরতির করে উঠল, অতএব ছ'টা। আর না, এবারে উঠতেই হবে।

কেননা, একটু পরেই ঠিকে ঝি এসে দরজায় হানা দেবে। তার আবার মিনিটের সবুর সয় না, দরজা খোলা না পেলে রক্ষা নেই, কড়কড় কড়া নেড়ে জানান দেবে পাড়াসুদ্ধ লোককে। দোতলায় মেজ জায়ের অনিদ্রা ব্যামো, হয়ত সকালের দিকে তিনি একটু চোখ বুঁজেছেন, খান খান ঘুমের ফলে ভাঙা মেজাজ নিয়ে তিনিই হয়ত আলুথালু হয়ে নীচে ছুটে আসবেন।

তার আগেই কুসুমকে উঠতে হবে। ঢালাই লোহার কারখানাটায় একশো কুকুর এক সঙ্গে কেঁদে ওঠে সাতটা বাজিয়ে দেবার আগেই।

গলায় আঁচলের বেড় দিয়ে পুবের ঈষৎ-লালচে আকাশকে গড় করবার সময়ও কিন্তু মনে হয়নি যে, এ-দিনটি অন্য কোন দিনের চেয়ে একটু আলাদা হবে। গরু যেমন ঠুলি-পরা চোখে ঘানির চারদিকে ঘোরে, এ-বাড়ির দিনগুলোও তেমনি অমোঘ কোন নিয়মে একটি নির্দিষ্ট পরম্পরার খুঁটিকে প্রদক্ষিণ করে।

উনুনটা ভিজে-ভিজে, ভাল করে জ্বলতে চায়নি। হাঁটু ভেঙে ফুঁ দিতে গিয়ে কুসুমের চোখে জল এসে গেছে। মানি ঝি ছাই-মাখা হাতের পিঠ গালে ঠেকিয়ে অবাক হবার ভঙ্গি করে বলেছে, 'ওমা ছোট বউদি, কাঁদছ?'

'কই, না ত'।

হালকা গলাতেই কুসুম বলেছে বটে, কিন্তু জ্বলে গেছে মনে মনে। হারামজাদীর সব ন্যাকামি। কাঁদ—ছ? মনে মনে কুসুম শব্দটাকে ভেঙে-ভেঙচে আবৃত্তি করেছে, তা'তে রাগটা আরও তেজী হয়ে উঠেছে। ন্যাকামি। উনুনে আঁচ দিতে হলে নাকের জলে চোখের জলে যে মিশ খেয়ে যায়, জানেন না যেন।

জানে না আবার, সব জানে। আসলে ওটা ঠাট্টা হল। মানি ঝি, অনেকদিন থেকেই কুসুম লক্ষ্য করেছে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায়, ফাজলামো করতে এগিয়ে আসে। মনে মনে কুসুমকে সে তার সমান দরের মানুষ বলেই জানে। এ-বাড়ির অন্য কোন বউ-ঝিকে ত জল-তোলা, উনুন ধরান, চা-তৈরি করার কাজে দেখতে পায় না। রোজ ভোরে তার সঙ্গে যার চার চক্ষুর মিলন হয়, সে কুসুম। সে যখন ছাই, শালপাতা আর বাসনের কাঁড়ি নিয়ে কলতলায় বসে, কুসুম তখন উনুন ধরায়। সুতরাং, মানি ঝি মনে মনে হিসাব করে নিয়েছে, সে আর কুসুম এক জাতেরই মানুষ,

ছু'জনেই ঝি, তবে কুসুম মোটামুটি ফর্সা কাপড় পরে কিনা, অতএব একটু উপরের ক্লাসের ঝি।

কে তাকে কী চোখে দেখে, সব টের পায় কুসুম, মুখে কিছু বলে না, উনুনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভাবে। তাই বলে কাঁদে না।

কান্না কুসুমের কবে শুকিয়ে গেছে।

আবার উনুনের মত হঠাৎ দপ্ করে কোনদিন জ্বলবে না। কুসুমের জ্বলুনিও কবে শেষ হয়ে গেছে!

কুসুম যে ঝি, একটু উঁচু ক্লাসের ঝি, এটা সে কবেই টের পেয়ে গেছে। যেদিন লাল-চেলি আর মুকুট পরে এ-বাড়িতে প্রথম পা রেখেছিল, সেদিন না হোক, তার দিনকতক পরেই। প্রথম দিন অবশ্য অনেক আলো জ্বলেছিল, চোখে ধাঁধা লেগেছিল। তা একটু লাগতে পারে বইকি। ঘন-ঘন উলু আর শাঁখে কানে কোন ছোট কথা আসেনি। কড়ি আর চাল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে করতে মনে হয়েছিল, গোটা জীবনটাই বুঝি এমনি খেলা-খেলা। ননদ-জায়েদের কেউ এসে কানে-কানে ফিস ফিস করেছিল, কেউ সাজিয়ে দেবার ছলে গালে টোকা দিয়ে পরখ করেছিল নরম কিনা; তখন কিছু বোঝা যায়নি। কুসুম ভেবেছিল, সে-ও বুঝি এদেরই একজন।

তা-যে নয়, সেটা টের পেয়েছে জোড়ে ফিরে এসে। দেখেছে বাড়তি লাইটগুলো ডেকরেটরেরা কবে খুলে নিয়ে গেছে; পাড়ার কুকুরগুলোকে মেটে গেলাস আর কলাপাতা চেটে চেটে খেতে দেখে গিয়েছিল, আজ একটি এঁটোপাতাও পড়ে নেই। সন্ধ্যার পর এ বাড়িতে মিটমিটে কয়েকটা আলো জ্বলে, একটা ছেলেদের পড়ার ঘরে, একটা হেঁশেলে, আর একটা বড়-জা'র ঘরে। অন্য কোথাও আলো জ্বলতে দেখলেই বিধবা ননদ এসে নিবিয়ে দিয়ে যায়। মিটার চড়বে। সেই নিবু নিবু আলোয় কুসুম টের পেল, লাল চেলিটা যেমন একদিনের, বন্ধুত্বের জলুস তেমনি দিন

সাতেকের। একটা বিয়ের পরদিন থেকেই তোরঙের নিচের ভাঁজে চাপা পড়ে রঙ খোয়াতে শুরু করে, বুনটটুকুও কবে খসে যায় কেউ টের পায় না। আরেকটাও ওপরের খোলসের মত খসে পড়ে। সাধারণ একটি মেয়ে দু'দিনের জন্যে রানীর পোশাক পরে বটে, কিন্তু সেটা ধার-করা। অভিনয়ের পরে খুলে দিতে হয়। স্টেজটা কম সময়ের, আসল সংসারটা আঁকা সীনের পিছনে, সাজঘরে। সেখানে রঙচঙে সব পোশাক খুলে ফেলে গায়ে আটপৌরে শাড়ি তুলতে হয়। রূঢ় হাতে ঘষে ঘষে তুলে ফেলতে হয় সব রঙ, শেষ অবধি সব মুছে সিঁথিতে হয়ত সামান্য একটু সিঁদুরের ছোঁয়া টিকে থাকে।

কুসুম তখনই জেনেছে, মাঝারি আয়ের যৌথ পরিবারে কয়েকটি অলিখিত নিয়ম থাকে। তার মধ্যে একটি হল এই যে, যে-বৌয়ের স্বামীর রোজগার সবচেয়ে কম, সে উঠবে সকলের আগে। উনুনে আঁচ দেবে, সেই আঁচের ধোঁয়া ঘুম ভাঙাবে অন্য ঝি-বৌদের; তারপর চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া বাড়ির ছেলে আর বাবুদের।

ডাক্তার ভাসুরের স্ত্রী বড়-জা যে-নিয়মে উকিল ভাসুরের স্ত্রী মেজ-জাকে একদিন রান্নাঘরে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেই নিয়মেই মেজদি কুসুম আসবার দিনকতক পরেই ছুটি নিলেন।

কেননা, প্রমথ বেকার, এটা ধরে, সেটা ধরে, আয়ের কিছু ঠিক নেই!

হেঁশেলে কুসুমকে বসিয়ে দিয়ে মেজদি বলেছিলেন, নাও ভাই, এবারে রানীগিরি কর।

রানীগিরিই বটে। ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে যখন চোখ ছলছল করে, পিঠে টান ধরে, তখন ঝাপ্‌সা আধো-অন্ধকার ঘরখানার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে অসম্ভব সব ভাবনার পাগলামি কি আজও কুসুমকে পেয়ে বসে না? একবারও কি মনে হয় না, এই কাঠের পিঁড়িটা আসলে তার সিংহাসন,

চ্যাপটা পিতলের হাতাটা রাজদণ্ড, এই ছোট, চাপা, সেঁৎসেঁতে হেঁশেলে কুসুম মহারানী? পাতে পাতে মেপে মেপে সে শাক-তরকারি ডাল পরিবেশন করে না, করুণা বিতরণ করে।

আজগুবী কল্পনা, অদ্ভুত, কিন্তু মাঝে মাঝে চারপাশের এই চাপা দেয়ালটাকে এক মন্তরে উড়িয়ে দিতে কার না সাধ যায়। না-হয় মন্ত্রটা মিথ্যাই।

তাই, মানি ঝি যখন গায়ে-পড়ে ভাব-করা গলায় বলেছে 'কাঁদছ,' কুসুম অহেতুক বেশি মাত্রায় চটে গেছে। নইলে কথাটার মধ্যে দোষ ধরবার কিছু ছিল না। দোষ বলবার ধরনে।

ছোটবাবু আজ এখানে নেই, না বউদি?'

কুসুম সংক্ষেপে বলেছে, 'না।'

'চাকরির খোঁজে বেরিয়েছে শুনলুম? যাক, তবু ভাল যে এতদিনে হুঁশ হল। কোথায় গেছে, জান?'

কুসুমের মনে হয়েছে, চীৎকার করে বলে যে, তুমি থাম, তুমি আর সই নও, কিন্তু ভীরুতা বা ভদ্রতায় আটকেছে। 'শোনপুরে।'

'সে আবার কতদূর। নাম শুনিনি ত।'

মুশকিল এই, শোনপুর যে ঠিক কোথায় বা কতদূর, কুসুমেরও জানা নেই। জানা নেই বলেই সে চটেছে আরও বেশি। শোনা-কথার ভরসায় আন্দাজে বলেছে, 'অ—নেক দূর। বড় রেল, ইস্টিমার, তারপর ছোট রেলে যেতে হয়।'

'কবে ফিরবে?'

'জানি না।'

মানি ঝির মুখ বন্ধ করবার জন্যেই কুসুম আরও জোরে জোরে চায়ের কাপে চামচ নেড়েছে।

দোতলার বারান্দায় বড় জায়ের মেয়ে মানসীর মুখ দেখা না গেলে মানি ঝি হয়ত থামত না।

'খুড়িমা, জল গরম হয়েছে?'

উপর দিকে ঘাড় তুলে চেয়ে কুসুম দেখতে পেয়েছে মানসীকে।

জোরে জোরে ব্রাশ ঘষছে, মুখভর্তি ফেনা, তারই অনেকখানি শব্দ করে ফেলেছে উঠোনে, আর একটু হলেই চৌবাচ্চাটায় ছিটে লাগত, কুসুম মনে মনে বলেছে অসভ্য মেয়ে, মুখে আনতে সাহস পায়নি, কোন দিনই পায় না। অতি মিহি, ভয়ে-ভালমানুষ গলায় বলেছে, 'এক্ষুণি হবে।'

'হয়নি বুঝি এখনও ?'

'এতক্ষণ বটঠাকুরের চা করলুম যে।'

থমথমে মুখ মানসীর, গলাটাও যেন ভারি ভারি। হয়ত ঘুমে, হয়ত রেগে গেছে বলে। রাগ করে আরও খানিকটা ফেনা উঠোনে ফেলেছে।

'কেতলিটা তুমি ওপরে পাঠিয়ে দাও খুড়িমা, গার্গল্ করবার মত গরম জল আমি নিজেই স্টোভে করে নিতে পারব। তোমার যখন অনেক কাজ—'

ভয়ে ভয়ে কেতলিটা তাড়াতাড়ি উনুনে বসিয়ে দিয়েছে কুসুম। আড়চোখে চেয়ে দেখেছে, মাথা নীচু করে বাটনা বাটছে বটে মানি ঝি, কিন্তু ঠোঁট টিপে হাসছে।

বড় ভাসুর কাগজ পড়ছিলেন, চায়ের বাটিটা অভ্যস্ত হাতে টেনে নিয়েছেন, এক চুমুক মুখে দিয়েই কাপটা সরিয়ে বলেছেন, চিনি কি ফুরিয়ে গেছে বৌমা ?'

লজ্জায় কুসুমের মাথা কাটা গেছে।

বড় ছোট এ-বাড়ির মানুষ, পান থেকে চুনটুকু খসলে ক্ষমা করতে জানে না।

মেজ-জা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলেছেন, 'বুলার দুধটা জ্বাল দিয়েছ ত ছোট বউ ?'

'দুধ ত আসেনি, মেজদি।'

'তোমার মেয়ে চুকচুক করে কী খাচ্ছে তবে, পিটুলিগোলা ?'

'কালকের বাসি দুধ, একটুখানি বেঁচেছিল মেজদি।'

'বাসি দুধ বুঝি ?' মেজ-জা ফিসফিস করেই বলেছেন, কিন্তু

ফিসফিস গলাও বাড়িসুদ্ধ লোকের কানে যেতে পারে, শুধু ঠোঁট-নাড়ার প্রক্রিয়াটি জানা থাকা চাই। কুসুমের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বারান্দার কোণে বসে খুকু তখনও শুকনো দুধের বাটিটার চাঁচি-মুচি চাটছিল, ভেবেছে বাটিটা কেড়ে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ঠাস করে মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে দেয় দেয়ালে, কাঁদুক ও, কেঁদে কেঁদে সারা হোক, ওর কপালটা সুপুরির মত শক্ত হয়ে উঠুক।

যে-নিয়মে এ-বাড়িতে কুসুমের সব কাজ সামলাতে হয়, সেই নিয়মেই তার বেকার স্বামী প্রমথ নিত্য বাজার করে। আজ প্রমথ নেই, বড়-জার ছেলে পটল বাজারে যাবে। পটলের হাতে ফর্দ তুলে দিলেন বড়দি, কুসুমকে বললেন, 'ওকে টাকা দিয়ে দাও ছোট বউ।'

টাকা? কুসুমের কাছে কবে আবার টাকা থাকে। টাকা ত বড়দিই রোজ দেন প্রমথকে।

বড়-জাও বুঝেছেন কুসুমের কাছে টাকা নেই। মুখখানা তাঁর ধীরে ধীরে কালো হয়ে এসেছে। 'ছোট ঠাকুরপোকে কাল বাজারে যাবার সময় দশ টাকার একখানা নোট দিয়েছিলুম, তা-থেকে বুঝি একটা পয়সাও বাঁচেনি ছোট বউ?'

বেঁচেছে কি না, তাই বা কুসুম কোথা থেকে জানবে। সে শূন্য চোখে চেয়ে থেকেছে। আঁচল থেকে খুলে তিনটে টাকা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বড় বউ বলেছেন, 'অথচ কাল শোনপুর যাবার নাম করে ঠাকুরপো ওঁর কাছ থেকে গুনে গুনে পাঁচটা দশ টাকার নোট নিয়ে গেছে, ছোট বউ।'

দুপ-দাপ করে বড় বউ উপরে উঠে গেছেন, আর অসাড় অবশ শরীরটা নিয়ে নিতান্ত যান্ত্রিক অভ্যাসেই পিঁড়িতে বসে খুন্তি নেড়ে গেছে কুসুম। ভিজে শাক থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উড়ছে, আঁচল হাওয়ায় কাঁপছে। না, হঠকারী কিছু কুসুম করবে না, করতে পারবে না, করতে চায় না।

এই নিগ্রহ ত নতুন কিছু না। এটাকে ত সে তার শাঁখা, নোয়া, এয়োতি চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছে। এ সব না

থাকলেই বরং অস্বস্তি হত, মনে হত কোথায় যেন হিসাব মিলছে না, আজকের সকালটা অন্য সব সকাল থেকে আলাদা মনে হত।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আলাদা হলও।

বেলা বাড়তে না বাড়তে একটু একটু মেঘ জমেছে, আকাশের রঙ বদলে গেছে, কিন্তু সেজন্যে নয়।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হতে কুসুমের মনে পড়েছে, ছাতে অনেক কাপড় শুকোতে দেওয়া আছে। সব তুলে তুলে জড়ো করে রাখছিল চিলেকোঠায়, হঠাৎ কুসুম দেখতে পেয়েছে বড় ভাসুর ফিরে আসছেন। হাতে খবরের কাগজ, সেটা দিয়ে মাথা আড়াল-করা, তাড়াতাড়ি পা ফেলছেন, কিন্তু এমন সময়ে ত উনি কোনদিনই ফেরেন না!

কুসুমের মনে পড়েছে, সদর দরজা বন্ধ; তাড়াতাড়ি নেমে এসে খুলে দিয়েছে, সরে দাঁড়িয়েছে একপাশে, ওর চোখে চোখ পড়তে বড় ভাসুর কেমন যেন চমকে উঠেছেন, লুকোতে গেছেন হাতের কাগজ, তারপর কোন দিকে না চেয়ে সোজা উঠে গেছেন উপরে।

এত তাড়াতাড়ি উনি ত কোনদিন সিঁড়ি ভাঙেন না।

কী জানি কী ভেবে কুসুমও পিছেপিছে উপরে উঠে এসেছে। হয়ত সামান্য মেয়েলী কৌতূহল। কিংবা অন্তর্যামীই হয়ত বুকের ভিতরে থেকে সব টের পাইয়ে দেন।

উপরে উঠে দেখেছে দরজা ভেজান, অবোধ শিকলটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। কুসুম যেন জানত, ভেজান থাকবে। কারণ নেই, তবু বুকের ভিতরটা শিকলটার মতই থেকে থেকে কেঁপে উঠেছে। কুসুম কান পেতেছে কপাটে। ওরা চাপা, ত্রস্ত গলায় কথা বলছে। কিন্তু প্রতিটি শব্দ শুনতে পেয়েছে কুসুম।

‘স্টীমার-ডুবি? কাল রাত্রে? কই সকালের কাগজে ত ছিল না।’

‘টেলিগ্রাম দুপুরে বেরিয়েছে। দানাপুর এক্সপ্রেসের প্যাসেঞ্জার

নিয়ে এই একটা স্টীমারই গঙ্গা পাড়ি দেয়। চড়ায় ঠেকে জাহাজ চৌচির হয়ে গেছে।'

'সব নাম বেরিয়েছে?'

'আস্তে। ছোট বউমার কানে এখনই যেন কিছু না যায়। নাম সব বেরোয়নি। সব লাশের কিনারা হয়নি ত। হলে বেরোবে আস্তে আস্তে।'

ঠিক তখনই ভয়ে-রক্তে একাকার হয়ে কুসুমের মনের মধ্যে সব জানাজানি হয়ে গেছে। ধপ করে কুসুম বসে পড়েছে বারান্দায়, দরজার বাইরে ধুলোয়। শব্দ পেয়ে বড়দি তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটে এসেছেন, ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছেন, আর কথা বলতে হয়নি, অমন ভারিক্কি গিন্নি মানুষ হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠেছেন।

কুসুমের চোখে তখনও জল আসেনি।

পর পর কী ঘটেছে, তাও ভাল করে টের পায়নি।

যেন মনে পড়ে, অনেকগুলো পায়ের শব্দ নানা দিক থেকে ওর কাছে এসে থমকে থেমেছে। নিঃশব্দ বোবা মুখের সারি, সকলেরই চোখে জল। কে যেন ওর পিঠে হাত রেখেছে।--বউ ওঠ।

কিছু বোঝেনি কুসুম, জিজ্ঞাসা করেনি কেন, তবু উঠেছে। হাত ধরাধরি করে ওরা ওকে পৌঁছে দিয়েছে ঘরে। সহানুভূতি দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢেকে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। কোলের কাছে এনে দিয়েছে খুকিকে।

এরা কারা। এই যে একজন ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে পাখার হাওয়া করছেন, আরেকজন হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন কপালে, কুসুম কি এদের জানে। কী জানি, কিছু মনে করতে পারছে না, সব যেন ধোঁয়া-ধোঁয়া, আবছায়া, চিনুক বা না-চিনুক, এরা সবাই ওকে ঘিরে আছে কেন। ওরা কি চেপে ধরবে কুসুমকে, একটু একটু করে পিষে দম বন্ধ করে মেরে ফেলবে ওকে? না-না, এই ত ওদের মুখ মায়া-মলিন, চোখ কান্না-কোমল। কার জন্যে কান্না,

কুসুমের? কী হয়েছে কুসুমের। কিছু ত হয়নি। এই ত সে দিব্যি শুয়ে আছে, দেখছে সাদা দেয়ালগুলো বকের পাখা হয়ে কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে গেল। গেল বটে, কিন্তু কী যেন নিয়ে গেল। কী। কী। ভাবতে গিয়ে মাথা ঘুরে গেল, হাতের উপরে ভর দিয়ে হঠাৎ উঠে বসতে গেল কুসুম। আর তখনই দু'টি ঠাণ্ডা হাত ওকে জড়িয়ে ধরল, অতি-মৃদু, অতি-সহৃদয় গলায় কে বলল, 'উঠো না কুসুম, আর একটু শুয়ে থাক।'

কুসুম? এ-নামে এই পাঁচ বছর এ-বাড়িতে কেউ ত তাকে ডাকেনি? চোখ মেলে কুসুম দেখল, বড়-জা। ওর মাথাটি কোলের ভিতর টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বলছেন, 'উঠো না কুসুম।'

কুসুম? আর কান্না ধরে রাখা যায়নি, বড়দির কোলের ভিতরে মুখ ডুবিয়ে কুসুম বলে উঠেছে, 'আমার যে সব ফুরিয়ে গেল, দিদি।'

'কুসুম শক্ত হও। খুকুর দিকে চাও। এখনই ভেঙে পড়ো না। সব খবর পাওয়া যায়নি ত। উনি আজই সন্ধ্যার ট্রেনে পাটনা যাচ্ছেন। উনি ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাক।'

সব কথা বোঝেনি, সব কথা কানেও গেছে কি না সন্দেহ, কুসুম অনেকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে থেকেছে। তারপর ধীরে ধীরে, নিস্তেজ গলায় বলেছে, 'তোমরা সবাই যাও। আমি একটু একা থাকব।'

ঢালাই লোহার কারখানায় একশো কুকুর গলা মিলিয়ে কেঁদে উঠতেই কুসুম চোখ মেলেছে। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেছে। মাথাটা এখনও ভারি, শরীরেও দুঃসহ যন্ত্রণা, জলের পিপাসা শুকিয়ে শুকিয়ে গলার কাছে কাঁটার মত শক্ত হয়ে ঠেকে আছে। কিন্তু আর সব ফাঁকা, সাদা, একেবারে শূন্য।

সে কোথায়। তার শোবার ঘরে? কিন্তু কারখানা ছুটি হল, বেলা গড়িয়ে গেছে, সে এখনও শুয়ে কেন।

সব কাজ এখনও বাকি না? উনুন ধরাতে হবে না? ইস্কুল-কলেজ থেকে ওরা সব এখুনি ফিরবে, ওদের খেতে দিতে হবে না?

পা টলছে, তবু দেয়াল ধরে কুসুম কোনমতে উঠে দাঁড়াতে গেল। কিন্তু পারল না, বিছানাতেই ওকে বসে পড়তে হল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল কে। বালিশের উপর ওর মাথা নুইয়ে দিয়ে বলল, 'উঠছ কেন, কুসুম, আরেকটু শুয়ে থাক না।'

মেজদির গলা।

অস্ফুট গলায় কুসুম বলতে গেল, 'কিন্তু, মেজদি, বিকেলের কাজকর্ম সব যে বাকি। ঘর ঝাঁট দেওয়া, উনুন ধরান, ঠাকুরকে জল-মিষ্টি দেওয়া, প্রদীপ দেখান—'

মেজদিকে বলতে শুনেছে, 'ছি ভাই ছি। আমরা কি পশু। কোন কাজ পড়ে থাকবে না, সব আমরা ক'জনে মিলে হাতে-হাতে করে নেব। দিদি, আমি, মানসীও আছে। এই দেখ, মানসী তোমার জন্যে দুধ গরম করে এনেছে, খেয়ে ফেলে আরেকটু শুয়ে থাক দেখি।'

কুসুম চেয়ে দেখেছে, গরম দুধের গ্লাস হাতে মানসী এসে দাঁড়িয়েছে। ছল-ছল চোখ। এই মেয়েটিই কি আজ সকালে তাকে ধিক্কার দিতে উঠোনে শব্দ করে দাঁত-মাজা ফেনা ছিটিয়ে দিয়েছিল? বিশ্বাস হয় না। ধোঁয়া নেই, জ্বালা নেই, আজকের সন্ধ্যা এমন নরম, কালো, সুন্দর হল কী করে। আর চারপাশের চেনা মানুষগুলো কি মন্ত্রবলে আলাদা হয়ে গেল। ভেবেছে কুসুম, কেবলি ভেবেছে। কিনারা পায়নি, কেঁদেছে। কেঁদে ঘুমিয়েছে।

আসল কান্নার পালা ছিল এরও পরে, কুসুম নিজেও জানত না।

একতলায় রাস্তার ধারে কুসুমের ঘর। বড়দি নিজে শুতে চেয়েছিলেন। কুসুম বলেছে, দরকার নেই। তবে মানসী আসুক? বড়দি বলেছেন, আজ একা শুতে নেই কুসুম, ভয় পাবে। কুসুম তাতেও রাজী হয়নি।—না দিদি, না। সব ভাবনা ঘুচে গেছে, আমি ভয় পাব কী। শুধু একটু ঘুমোব।

শেষ পর্যন্ত মানি ঝি দরজার বাইরে মাদুর পেতে শুয়েছে।

সেই ভয় পেতে হল। আরও কান্না কাঁদতে হল।

ভয় এল মাঝরাতের কাছাকাছি একটা সময়ে। জানালার ঠকঠক শব্দ শুনেছিল ঠিকই, কুসুম ত আর ঘুমোয়নি। প্রথমে ভেবেছিল বাতাস। কিন্তু বাতাস কি এমন চুপ পায়ে আসে, এমন গুনে গুনে টোকা দেয়? তবে। বুকের উপরে হিম হাত দু'টি জড়ো করে কুসুম শুয়েছিল, একটা একটা করে টোকা গুনছিল। মনে মনে বলছিল, সব তো গেছে, আমার আবার ভয় কী, তাই চেঁচায়নি। তারপর টোকা থেমে গেছে, কুসুম শুনতে পেয়েছে, অতি নীচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। চেনা গলা। বিদ্যুতের ছোঁয়া ছড়িয়ে গেছে সমস্ত দেহে। কুসুম উঠে বসেছে। নিশিতে-পাওয়া গলায় বলেছে, যাই; আচ্ছন্ন অভিভূতের মত ছিটকানি খুলে দিয়েছে।

কপাট আলগা হতেই প্রথম দমকা হাওয়া তারপর সেই হাওয়ার পিছে পিছে যে চৌকাটে এসে দাঁড়িয়েছে, তার অবয়বের আভাস ছাড়া কিছুই দেখা যায় না, তবু কুসুমের চিনতে ভুল হয়নি, পা থেকে মাথা অবধি একবার থরথর করে কেঁপে উঠেছে, আহ্লাদ, অবিশ্বাস, আতঙ্কমেশান কণ্ঠে কুসুম বলে উঠেছে, 'তুমি?'

আগন্তুক এগিয়ে এসে ওকে কাছে টেনে নিয়েছে। তার বুকে মুখ লুকিয়ে কুসুম শুনতে পেয়েছে, 'আমি। আমিই ত। প্রমথ। ভয় পেয়েছিলে?'

কুসুমের না-বাঁধা চুলে আঙুল বুলিয়ে প্রমথ বলে গেছে, 'সত্যিই আমি। ভূত নই। আলো জ্বালিয়ে দাও; দেখবে আমার ছায়া পড়েছে।—ভূতের কি ছায়া পড়ে?'

প্রমথর বুকে মুখে রেখেই একেবারে ছোট্ট খুকিটির মত গলায় কুসুম বলেছে, 'না।'

'আলো জ্বালবে না?'

'আমার আলোর দরকার নেই।' হাত বাড়িয়ে প্রমথর চুল

ছুঁয়েছে কুসুম, চোখের পাতায় নরম দু'টি আঙুল রেখেছে। তারপর নাক, ঠোঁট, গলা পেরিয়ে হাত রেখেছে রোমশ বুকে, সজোরে আঁকড়ে ধরে ঘ্রাণ নিয়েছে। নিঃশব্দ থরথর পরীক্ষা সাঙ্গ হলে বলেছে, 'তুমি, তুমিই ত। তুমি, তুমি, তুমি।' যেন ওই 'তুমি' কথাটা মন্ত্রের মত, ওর মধ্যে সব ভরসা লুকোন আছে।

অনেক পরে কুসুম ধীরে ধীরে বলেছে, 'তবে যে—খবরের কাগজে···সব মিথ্যে।'

মিথ্যে কেন। স্টীমার ডুবিটা-সত্যি। সেই স্টীমারে প্রমথ ছিল এও ঠিক। সকলের সঙ্গে সেও ছিটকে পড়েছিল জলে, ভাসছিল, ডুবছিল, ফের ভাসছিল। অন্ধকার রাত্রি, কী খরস্রোতের টান, সেই টানে কতজন তলিয়ে গেল, আকাশের তারা, যাদের ছায়া-চর থাকে জলের নীচে—ছাড়া সে-হিসাব কেউ রাখে না। অনেক দূরে একটা আলোর বিন্দু, মজ্জমান চেতনা নিয়েও প্রমথ বুঝেছে ওই বিন্দু হল তার প্রাণ, প্রাণের প্রতীক, ওখানে পৌঁছতে হবে, ওকে ছুঁতে হবে। একটি ইচ্ছার ফলকে সমস্ত শক্তিকে গ্রথিত করে প্রমথ ঘোলা জল ঠেলে সেদিকে এগিয়ে গেছে।

'তারপর?' কুসুম রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছে।

তারপর আর মনে নেই। সেই বিন্দুটা বুঝি ছিল মাঝি-নৌকো, তারা কখন এসে তাকে তুলে নেয়, তাকে এবং আরও ক-জন যাত্রীকে, কিছু মনে নেই। ভোরবেলা মাঝিরা তাদের পৌঁছে দিয়েছে পাড়ে; তার কাছাকাছি কোন রেল স্টেশন নেই। কিন্তু একটা গঞ্জ আছে। মাঝিরা গরম দুধ দিয়েছিল, দয়াপরবশ হয়ে একটা ধুতি দিয়েছিল পড়তে; গঞ্জের ডাক্তারবাবু ওকে একদিন হাসপাতালে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রমথ বাড়ি ফেরবার জন্যে ব্যাকুল, কিছুতে রাজি হয়নি। ডাক্তারের কাছে কিছু পয়সা চেয়ে নিয়ে বাসে উঠে বসেছে। তারপর কী করে নানা শহরে-বাজারে বাস-বদল করতে করতে বাড়ি এসে পৌঁছল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। সবটা সবিস্তারে বলল না প্রমথ।—'আজ আমি বড় ক্লান্ত। কাল শুনো। সকালে

সবাইকে ডেকে যখন যমের দুয়ার থেকে মানুষ-ফেরার গল্প বলে তাক লাগিয়ে দেব, তখন। কেমন?'

কুসুম ধরা-ধরা গলায় বলেছে, 'শুনে আমার দরকারও নেই। তুমি ফিরে এসেছ এই ঢের।'

হাত বাড়িয়ে হঠাৎ আলোটা জ্বেলে দিয়েছে প্রমথ। কুসুমের পূর্ণায়ত চোখে চোখ রেখে বলেছে, 'তুমি বুঝি আজ সারাদিন কেঁদেছ?'

'বা-রে, কাঁদব না?' কুসুম অবাক হয়ে অনর্গল গলায় বলে গেছে, 'তুমি কী-যে। জান, খবরটা শুনেই বটঠাকুর পাটনা রওনা হয়ে গেছেন? বড়দি মেজদি ওঁরা সারা দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা আমাকে আগলে রেখেছেন, মাথা তুলতে দেননি; সংসারের সব কাজ আজ ওঁরাই হাতে হাতে সেরেছেন, আমাকে কিচ্ছু ছুঁতে হয়নি, জান?'

'তবে ত তোমার আজ ছুটি গেছে।' প্রমথ ঠাট্টার সুরে বলেছে।

'ছুটিই তো।'

এর পরেই সেই কঠিন পরীক্ষাটা এসেছে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলে প্রমথ হঠাৎ ওর মুখখানা দু'হাতে টেনে নিয়ে বলেছে, 'সারা দিন অনেক ত কেঁদেছ কুসুম, এবারে একটু হাস।'

'হাসব? আচ্ছা হাসি।' কিন্তু সেই মুহূর্তে কী মনে পড়ে গেছে, থরথর করে কেঁপে উঠেছে সারা শরীর, চেষ্টা করেও কুসুম হাসতে পারেনি। চোখের কোলে জল এসেছে, ঠোঁট, চিবুক, চোয়াল বেঁকে দুমড়ে কঠিন হয়ে গেছে, কিন্তু এক রতি হাসি ফোটেনি। অক্ষমতায়, লজ্জায় করুণ মুখচ্ছবি দু-হাতে ঢেকে কুসুম কোনমতে বলেছে, 'আলো নিবিয়ে দাও।'

তারপর, অন্ধকার ঘরে একটি মেয়ের পাশে শুয়ে শ্রান্ত প্রমথ অনেক—অনেকক্ষণ ধরে তার অবিরল কান্নার ধ্বনি শুনেছে। মাথায়

পরম মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়েও সেই কান্না থামাতে পারেনি, প্রমথ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেছে।

আবহাওয়াটা লঘু করে দিতেই হয়ত এক সময়ে বলে উঠেছে, 'এতক্ষণে বুঝেছি। ভেবেছিলে আপদ গেছে, আমি আবার ফিরে এসেছি এটা তোমার ভাল লাগছে না, তাই কাঁদছ, না?'

প্রমথর মুখে হাত-চাপা দিয়ে কুসুম ভিজে গলায় বলেছে, 'ছি।'

'তবে কাল থেকে ফের সংসারের সব খাটুনির ভার এসে ঘাড়ে পড়বে, সেই ভয়ে বুঝি?'

কুসুম আবার বলেছে, 'ছি। তুমি কি আমাকে এমনি ভাব?'

প্রমথ এবার অস্থির, রূঢ় কণ্ঠে বলে উঠেছে, 'তবে কী, তবে কী। কেন এই অর্থহীন কান্না।'

কুসুম কিছু বলেনি। বলতে চেয়েও পারেনি। গুছিয়ে বলতে শেখেনি বলেই পারেনি। যদি বলে, সে কাঁদছে বড়-জা, মেজ-জা আর মানসীর কথা ভেবে, তাহলে প্রমথ কি বুঝবে, না বিশ্বাস করবে?

অথচ সত্যিই তাই। কুসুম আজই প্রথম জেনেছে, পৃথিবীর লোক ভালও হতে পারে। এমন কি, যে মানুষগুলো খারাপ, সময়ে সময়ে তারাও আলাদা হয়ে যায়; অন্যের শোকে কাঁদে, পাশে এসে দাঁড়ায়। যেমন আজ বড়দি মেজদিরা দাঁড়িয়েছিল। কুসুম কেঁদেছে এই জানার আনন্দে।

আবার দুঃখেও। আলাদাই হল যদি, এত অল্প সময়ের জন্যে হল কেন। মাত্র এক দিনের জন্যে কেন। সংসারের খাটুনির ভয়ে নয়, রাত পোহাতেই যে মানুষগুলো আবার সেই সামান্য আর হিংসুটে আর ছোট হয়ে যাবে, তাদের করুণা করেও কুসুম কেঁদেছে।

কিন্তু এ সব কথা বুঝিয়ে বলা ত সহজ নয়। কেঁদে কেঁদেই সে একটি কান্নার মানে বলতে চেয়েছে কি সাধে।

কস্তুরীমৃগ

সবে সন্ধ্যাবেলার আলো জ্বেলে নির্মলা একটা শেলাইয়ের নমুনা নিয়ে বসেছিল ; খবরটা শুনে হাতে ছুঁচ ফুটে গেল, মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল মুখ। রুদ্ধশ্বাসে নির্মলা বললে, বলিস্ কি ? এই ত একটু আগেই আমি ওকে ওপরে উঠতে দেখেছি।

বৌদি বললে, আমি নিজে চোখে দেখে এলাম যে। ডাক্তার ডাকতে চাকরটা ছুটল, করবী চোখ মুছছে, আর অজয়বাবু অফিসের পোশাক পরেই বিছানায়—

আর কিছু শোনবার প্রয়োজন ছিল না। শেলাই ফেলে নির্মলা ওপরে ছুটল। সিঁড়ির মুখটাতে এসে আর এগোতে পারল না। থরথর করে পা কাঁপ্ছে। ঘরের মধ্যে কেমন একটা চাপা গুঞ্জন। করবী কি এরই মধ্যে কাঁদতে শুরু করেছে। শক্ত করে রেলিং ধরে এক মুহূর্ত দাঁড়াল নির্মলা। এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেল।

শেড্ দেওয়া আলোটাকে আরো বুঝি স্তিমিত করে দেওয়া হয়েছে। পায়ের কাছে করবী, মাথার ঘোমটা খসানো, পরনের শাড়ীটার পাড় কি গাঢ়, অস্বস্তিকর লাল। শিয়রের কাছে ডাক্তারবাবু।

নির্মলা চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। ভেতরে ঢুকতে পা সরল না। দীর্ঘ, অসহায় আঙুলগুলো দিয়ে অজয় বালিশের কাছে কি যেন খুঁজছে। নাভিমূলের সে কী ওঠা-পড়া !

ডাক্তার শেষ বারের মত ইঞ্জেকশন দিলেন, আর নির্মলা চৌকাঠের ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে শ্বাসকষ্টের শব্দ শুনল। তারপর আস্তে আস্তে কখন সেই শব্দ ক্ষীণ হয়ে এল। এই শেষ বার, নির্মলা শুনছে, আর তল্‌পেটটা উঠবে না। না, আবার ওঠে যে ! শব্দ ক্ষীণতর। তবে এই শেষ ; শেষ, শেষ, শেষ,—না, এই যে

উঠেছে। পুকুর-ঘাটে দাঁড়িয়ে ডুব-সাঁতার দেখার মত এ কি নিষ্ঠুর মজার খেলা নির্মলাকে পেয়ে বসেছে। এই শেষ, এই শেষ করেও সাত বার হয়ে গেল, আর কত। আট, আট, আট,—এই নয়। সুইচ-অফ-করা পাখা শেষ বারের জন্যে কখন ঘুরবে, তাই দেখতেই অপলক, অবশ কৌতূহলে নির্মলা চেয়ে আছে। দশ। এখন আর শোনা যায় না, স্পন্দন মিলিয়ে এসেছে। এগারোই শেষ। অন্তত পোনোরো অবধি গুণতে পারবে নির্মলা ভেবেছিল, তা আর হল না। এগারোতেই ফুরিয়ে গেল।

আরেকটু আগে এল না কেন, আরেকটু আগে থেকে কেন গুনতে শুরু করল না, তা হলে অনেক দূর অবধি গোনা যেত। পোনেরো কেন, পঞ্চাশ।

বুক থেকে গলা পর্যন্ত ভারি কী একটা জিনিস উঠে এল, এরি নাম কি কান্না। এ কান্না কি অজয়ের ফুরিয়ে যাওয়ার, না পোনেরো অবধি গুনতে না পাওয়ার ?

আকাশের শেষ নীল মুছে সন্ধ্যা নামার মত অজয়ের চোখের পাতা দু'টি নেমে এল।

চৌকাঠ শক্ত করে ধরে নির্মলা দাঁড়াল। যন্ত্রটা গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার বাবু বেরিয়ে গেলেন।

—সন্যাস, আমার কিছু বলবার ছিল না। সেরিব্রাল হেমারেজ। কতকটা স্বগত, কতকটা নির্মলাকে শুনিয়ে যেন কৈফিয়তের সুরে ডাক্তার বাবু বললেন। আমি ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখে রাখছি, খানিক পরে ডিসপেন্সারি থেকে নিয়ে যাবে। না, না, না! ভিজিট নিতে পারব না।

করবী বিছানার ওপরেই লুটিয়ে পড়েছে। শিয়রের কাছে পিসিমা দাঁড়িয়ে এতক্ষণ হাওয়া করছিলেন, তিনি এক হাতে চোখে আঁচল তুললেন। আরেকখানা হাত সান্ত্বনার ভঙ্গিতে করবীর পিঠের ওপরে। পিঠটা ফুলে-ফুলে উঠছে করবীর ; উচ্ছ্বসিত অনর্গল অশ্রুপ্রবাহের পূর্ব-মুহূর্ত।

আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। পাশের বাড়ির, পাড়ার লোকেরা এলেন। সিঁড়িতে জোড়া-জোড়া জুতোর আওয়াজ। নিচে থেকে নির্মলার বৌদিও অসুখের বিছানা ছেড়ে আবার উঠে এসেছে।

—বাবা-মাকে খবর দেওয়া হয়েছে? ভিড়ের ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলেন।

—টেলিগ্রাম গেল ত এই একটু আগে। হয়ত কালই সকালে এসে পৌঁছবেন। আর এখন আসা-না আসা! দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিসিমা বললেন।

আস্তে আস্তে নির্মলা চলে এল নীচে। আর পাঁচ জন আপাত-অভিভূত আগন্তুকের মত সে ত আর সান্ত্বনা-সত্র খুলে বসতে পারবে না। করবীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই চড়ছে। পাগলের মত মেজেয় মাথা খুঁড়ছে এখন, খাটের পায়াতেও। তিনজন বর্ষীয়সী মহিলাও ওকে ধরে রাখতে পারছেন না। করবীর সঙ্গে এখন গলা মিলিয়েছেন পিসিমা, ততটা উচ্চগ্রামে নয়, মিন্‌মিনে, থেমে-থেমে, একটানা, একঘেয়ে। একে একে খবর পেয়ে আরো অনেক আত্মীয় আসছেন, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, পটলডাঙ্গা, শোভাবাজার থেকে, এসেই শোক-সংকীর্তনে দোহার ধরছেন। মূল গায়েন অবিশ্যি করবী।

আজকের দিন ত করবীর। কারুর ভাই গেল, কারুর কাকা, কারুর মামা। কিন্তু সব-কিছু গেল করবীর।

আর সেই বিগলিত তুষার-প্রবাহের মধ্যে পাথরের মত নিশ্চল নির্মলা। মাঝে মাঝে চোখের পাতা ভিজে উঠছে,—পারলে সে-ও বুঝি লুটিয়ে পড়ত করবীর মতই আকুল হয়ে মেজেয়। কিন্তু উপায় নেই। আজকে শোকের সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত করবীর জন্যে, ছিটে-ফোঁটা বখরা অন্য আত্মীয়স্বজনের। নির্মলার ভাগে শূন্য।

কী দুঃসাধ্য প্রয়াসে নিজেকে ধরে রাখতে হচ্ছে নির্মলার, নির্মলাই জানে। বৈধব্যের চেয়েও বুঝি এ-সংযম কঠোরতর।

নিচে এসেও নিস্তার নেই। ওপরের কোলাহল ক্রমেই বাড়ছে।

রাস্তার ধারের রেলিং ধরে নির্মলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কোন কাজে মন নেই। কিছুতেই কি মন আছে আজ!

এখন ছাত্ররা আসছে দলে দলে। শেষ বারের মত তাদের প্রিয়তম অধ্যাপককে দেখবে। ফুলের তোড়াও আসছে। একটা খাটিয়াও এসে গেল। ওই খাটিয়াতে করেই কি আজ অজয়কে নিয়ে যাবে—ওই মালা আর তোড়ায় ঢেকে? দাহের আগে পুষ্পসমাধি? নির্মলা চেয়ে দেখতে পারবে না কিছুতেই।

অজয়ের বন্ধুরাও এল। কলেজের সহকর্মীরা রাস্তায় পায়চারী করছেন মাথা নিচু করে। মৃদু স্বরে মৃতের অশেষ গুণাবলীর আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। শব-ব্যবচ্ছেদের মত কীর্তি-ব্যবচ্ছেদ।

আর সব-কিছু ভাসিয়ে, সব ডুবিয়ে করবীর কান্নার রোল। কোন বাধা মানছে না, আব্রু নেই কোন, কিম্বা ঘরনীসুলভ নম্রতা। ঘরই যার ঘুচেছে, সে আবার ঘরনী কী।

সব কথা পরিষ্কার বোঝা যায় না, বুঝতে চেষ্টা করবার মত মনের অবস্থাও নয়। হয়ত বিবাহিত জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনার উল্লেখ করছে করবী, যার প্রতিপাদ্য হল অজয় তাকে কত ভাল-বাসত। দাম্পত্য-জীবনের যে-সব খুঁটিনাটির কথা আগে অন্য কাউকে বলা দূরে থাক, অবসর সময়ে নিজে কল্পনা করতেই করবী লজ্জারুণ হয়ে উঠত, সেই সবই এখন তার-স্বরে সবাইকে জানাতে তার কোন সংকোচ নেই।

স্তবকে-স্তবকে কান্না, ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কথা, আর ফিরে-ফিরে ধুয়োর মতো—'আমার এ কি সর্বনাশ হল পিসিমা, কি সর্বনাশ হল।'

চোখের জল আর বুঝি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না নির্মলা, অন্তস্তলের সমস্ত আলোড়ন পল্লব দু'টি ছাপিয়ে উঠছে।

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে নির্মলা ফিরে তাকাল। ওর বৌদি। এতক্ষণে নেমে এল নিচে। খিন-খিন গলায় বললে, রান্না-টান্না কিছু করেছ ঠাকুরঝি?

কথা বলতে গিয়ে নির্মলার স্বর ফুটল না, মাথা নাড়িয়ে জানালে, না।

—সে কী! তোমার দাদা এখুনি এসে পড়বেন যে? আর ছেলেপুলেদের কাকেই বা আমি কি বোঝাব? ও মা, তোমার চোখ দু'টো অমন টস্‌টসে লাল কেন! তুমিও কাঁদছিলে নাকি? একটু দম নিয়ে বৌদি আবার বলতে শুরু করল, তুমি কিন্তু অবাক করলে ভাই। দুঃখ কি আমাদের হয়নি, এমন বয়সে অমন লোকটা চলে গেলেন! কিন্তু তাই বলে একেবারে চোখে জল?

একটি কথারও জবাব না দিয়ে নির্মলা মুখ ফেরাল। বৃথা। এরা বুঝবে না। আর সত্যিই ত? ওপরের ঘরের ভদ্রলোক মারা গেছেন, তার জন্যে সৌজন্যসম্মত একটু আহা-উহু করা যেতে পারে, কিন্তু নিচের ঘরে উনুন জ্বলবে না এ কেমন কথা!

রান্না-ঘরে গিয়ে বসল নির্মলা। একটুখানি কেরোসিন তেল ঢেলে ঘুঁটেয় দেশলাই ছোঁয়াতেই দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। সেই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে নির্মলার চোখ জলে ভরে গেল। ভরুক এখন আর আঁচল দিয়ে মুছতে ত হবে না। এখানে কেউ দেখবে না, দেখলেও ভাববে না কিচ্ছু। উনুনের আঁচেও তো চোখ জ্বালা করে, জলে ভেসে যায়?

বিকট একটা হরিধ্বনি উঠল। এই বুঝি ওরা ধরাধরি করে অজয়কে নামাল নিচে। একবারের জন্য যাবে না কি ছুটে শেষ বারের মত দেখে আসতে? করবীর কান্না আবার উচ্চতম গ্রামে উঠেছে। ওপরের ঘরে ঝটপট দুপদাপ আওয়াজ—সকলের হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইছে করবী। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ধরে রেখ না, আমিও যাব।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে করবীর ওপর প্রচণ্ড রাগ হল নির্মলার। এই মেয়েটার আকাশ-ফাটানো চীৎকারের মধ্যে অতল শোকের গভীরতা নেই, আত্মপ্রচারের বিস্তার আছে। বার বার আমার কী

হল বলে, যে গেছে সে যে তার ছিল—একান্তই তার, এই কথাটাও যেন করবী বলতে চাইছে।

আজকের এই যে এত অশ্রুপাত, এ শুধু অজয়ের জন্যেই নয়, যে-অজয় এখন অতীত,—করবীর জন্যেও, যার প্রজ্বলন্ত বর্তমানের পরে পড়ে আছে শুধু দগ্ধশেষ ভবিষ্যৎ। এই শোক-নাটিকার করবীই নায়িকা। অন্তত এই মুহূর্তে সকলের তপ্তশ্বাস সমবেদনা করবীর চারপাশে এক জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছে, সহস্র জিহ্বা শিখাগ্নির মধ্যে দাঁড়িয়ে করবী সব-খোয়ানোর মহিমায় মহীয়সী।

আর সে? প্রধূমিত উনুনের ওপর ফুটন্ত হাঁড়িটার দিকে চেয়ে তিক্ত একটা অনুভূতিতে সারা শরীর কেঁপে উঠল নির্মলার। তার কথা কেউ জানে না। জানাতেও পারবে না কাউকে। নুয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেলেও আঘাতের বোঝা একাই বইতে হবে।

এই ত জীবন! এত তেজ, এত দীপ্তি, সব একটি মাত্র ফুঁয়ের অপেক্ষা। নইলে আজও তো কলেজ থেকে সময় মত ফিরেছিল অজয়, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় নির্মলার চোখে চোখ পড়তে অল্প একটু হেসেও ছিল।

সেই মানুষই, কে জানত, আধ ঘণ্টার মধ্যে অসুস্থ বোধ করবে, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু যাবে ফুরিয়ে?

তর্জনীর অগ্রভাগ দিয়ে মেজের ওপর ধূলো কেটে কেটে নির্মলা শুরু করল :—

'অজয়···

মনে আছে অজয়ের সঙ্গে যেদিন প্রথম আলাপ হল। এ বাড়িতে এসেই বিকেল বেলা করবীর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিল। ওপরের ঘরের ভাড়াটে, আলাপ রাখা ভাল। গিয়ে দেখল, নেহাত অপরিচিত নয়। কথায় কথায় অজয়ের পরিচয় প্রকাশ পেল। দেয়ালে টাঙানো একটা ছবিও দেখলে

নির্মলা। সম্পর্ক ঘুচিয়ে আসা শ্বশুরবাড়িতে কবে না কবে দেখেছিল, কিন্তু মনে পড়ল ঠিক।

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বুঝি গল্প করছিল। পিছনের দিকে পায়ের শব্দ হতেই আন্দাজে মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়েছিল, মনে আছে।

করবী দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, এসো না। নির্মলাকে বললে, আর আপনিই বা অত লজ্জা করছেন কেন! একটু আগে ত বললেন, চেনা মানুষ, সম্পর্কে ঠাকুরপো। চেনা বামুনের যেমন পৈতে লাগে না, চেনা মানুষের কাছেও লাগে না ঘোমটা।

—অনেক বছর দেখা শোনা না থাকলেও? মাথার কাপড় টেনে, সিঁথির আধখানা অবধি খোলা রেখে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করেছিল নির্মলা।

তারপর পরিচয় সম্পূর্ণ করে দিয়েছিল করবী নিজেই।—শালটিক্‌রির দত্ত বাড়ির বৌ। সম্পর্কে তোমার বৌদি হলেন, না?

নির্মলা মৃদুস্বরে বললে, কলেজে পড়বার সময় দেখেছেন ঠাকুরপো, আপনার মনে নেই। তারপর আপনিও আর ওদিকে যাননি, আমিও কপাল পুড়িয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলাম।

এতক্ষণ বুঝি অজয়ের নজর পড়েনি, কপালপোড়ার ইঙ্গিতে খেয়াল হল। করুণা-স্নিগ্ধ চোখে দেখেছিল নির্মলার নিরঙ অঙ্গাবরণ, রুক্ষপ্রায় চুলগুলির মাঝখান দিয়ে প্রায় মিলিয়ে আসা সাদা একটু সিঁথি। আভরণের মধ্যে দু'হাতে দু' গাছি মোটে রুলি।

নির্মলা করবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমার শ্বশুরবাড়ির বৈঠকখানাই ওঁদের তাসের আড্ডা ছিল কি না। ওঁর মামাবাড়ি ছিল পুবের বাড়ি, আমাদেরটা উত্তরের। অনেক রাত অবধি ওঁরা হৈ হল্লা করতেন, চায়ের ফরমাশ যোগাতাম আমরা। তখন ওঁর কথা প্রায়ই শুনতাম কিন্তু।

অজয় জামা খুলছিল। জিজ্ঞাসা করলে, প্রায়ই শুনতেন? কেন?

—বাঃ রে, লেখাপড়ায় আপনার কত নাম ডাক! শুনতাম হীরের টুকরো। আমাদের বিদ্যে না থাকুক, বিদ্যের আদর ত বুঝি। অজয়ের স্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মলা বলে গেল, ম্যাট্রিক, আই, এতে জলপানি পেলেন, বি, এ, এম, এতে ফার্স্ট ক্লাস। কলেজে প্রফেসারি পেলেন, তাও শুনেছি। তারপর আপনি আর মামাবাড়ির দেশে বেশী যাননি কিন্তু।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অজয় বলেছিল, প্রশংসাগুলো শুনে রাখ। তোমার পতিভক্তি বাড়বে।

নির্মলা উঠে দাঁড়িয়েছিল। আচ্ছা, তবে চলি ভাই, অনেক কাজ পড়ে আছে। এখনো কিছু গোছানোই হয়নি। আপনারা গল্প সল্প করুন। নমস্কার ঠাকুরপো।

—নমস্কার। অজয় বললে,—তারপর আসল কথাই ত জিজ্ঞাসা করা হয়নি। এখানে—

—কি সূত্রে এসেছি, এই ত? সূত্রটুত্র কিছু নেই ঠাকুরপো। বরং সূতো ছিড়ে উড়ে এসেছি বলতে পারেন। আমাদের দেশ থেকে কত লোক আসছে, দেখেননি।

তারপর নির্মলার হয়ে করবীই ব্যাখ্যা করে দিয়েছিল: ওঁরা নিচের ঘরে নতুন ভাড়াটে এসেছেন।

—নিচের ঘর? নিচে আবার ঘর কোথায়? ওটা ত গুদাম! ওখানকার গরমে প্যাকিং করা বাক্সগুলো পর্যন্ত ঘেমে ওঠে যে! অজয় বলেছিল।

নির্মলা হেসে বলেছিল, পাকিস্তান থেকে যারা এসেছে তারা সচ্ছন্দে থাকতে পারে। বিধবা হয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, শুনলেনই ত। সেখানেও বড় কেউ বাকি রইল না। বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন, মা-ও গেছেন এই কয়েক বছর আগে। খুড়তুতো ভাইয়ের সংসারে গিয়ে উঠলাম, তাঁদেরই সঙ্গে ভাসতে

ভাসতে এই কলকাতায়। যাবেন, আমার দাদার সঙ্গে একদিন আলাপ করে আসবেন।

অজয়ের সৌজন্য বোধ অপরিসীম। পরদিনই কলেজে যাবার মুখে নির্মলার দাদার সঙ্গে আলাপ করে গেল।

নির্মলার দাদা বললেন, আমার নাম শ্রীপরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দেশে জমি-জমা ছিল, সদরে আদালতের পাশে হোটেলও ছিল একটা। সব ছেড়ে-ছুড়ে কলকাতায় আসতে হল। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দুর্ভোগের অন্ত নেই, তারপর বিধবা এক বোন গলগ্রহ। কি বিপদ বলুন ত?

—বিপদ বৈ কি। সহানুভূতির সুরে অজয় বলেছিল।

—গবর্নমেণ্ট থেকে নামে মাত্র একটা গ্র্যাণ্ট পাচ্ছিলাম মশাই, শুনেছি তা-ও বন্ধ হয়ে যাবে। দেশ থেকে সামান্যই আনতে পেরেছিলাম। দেখি যদি একটা হোটেল খুলতে পারি এখানে। আছে না কি আপনার জানা-শোনার মধ্যে তেমন ঘর?

আড়ালে দাঁড়িয়ে নির্মলা সব শুনছিল; হাসছিল আপন মনেই। করবীর কাছে শুনেছে, অজয়কে আজকাল কলেজে দু'শিফ্‌টে পড়াতে হয়; ইউনিভার্সিটিতে সপ্তাহে যেতে হয় এক ঘণ্টা করে। হোটেল-ঘরের সন্ধান পাবার জন্যে আচ্ছা লোক 'ঠাউরেছেন দাদা!

ধারাবাহিক ভাবে কিছু মনে পড়ে না, একটা-দু'টো একটা-দু'টো করে অসম্বদ্ধ স্মৃতির টুকরো বিহ্বল চেতনার হাওয়ায় উড়ছে।

নির্মলার মনে পড়ল, অজয় অনেক দিন পরে একদিন কথায় কথায় বলছিল, প্রথম যেদিন দেখে সেদিনই নির্মলাকে ওর ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল ওর কৃচ্ছ্রতা-শুভ্র বৈধব্য; সহজ, শোভন স্বাচ্ছন্দ্য; কথা বলার পরিমিত সংযত ভঙ্গি। কিন্তু সব

চেয়ে অজয়ের যেটুকু ভাল লেগেছিল, তা না কি নির্মলার দৃষ্টির বিষণ্ণ সুদূরতা।

গুছিয়ে কথা বলতে পারত না ত, ওই ক'টা কথা বলতেই অজয়ের চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল।

প্রায়ই দুপুরে করবীর সঙ্গে গল্প করতে ওপরে যেত। বেলা পড়তে-পড়তে এসে পড়ত অজয়, সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে নির্মলা উঠে দাঁড়াত। চলে আসতে পারত না। বেশীর ভাগ দিনই অজয় চা খাইয়ে তবে ছাড়ত।

সেই চা খাওয়া ক্রমশ নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। নির্মলা শুধু চা খেতেই ত যেত না, চা তৈরিও করত। কী একটা নেশা আছে যাদের ভাল লাগে তাদের নিয়ে একসঙ্গে বসে চা খেতে, খাওয়াতে। ঢং ঢং করে তিনটে বাজতেই অদৃশ্য একটা আকর্ষণ বোধ করেছে ওপরের ঘরের দিকে। চায়ের তৃষ্ণা? একটু আগেই ত ভাত খেয়ে উঠেছে, নতুন করে চায়ের তৃষ্ণা তখন ত পাওয়ার কথা নয়। তবু, তবু, তবু। ভরা কলসী উপুড় করে নতুন করে জল আনতে যাওয়ার অর্থহীন অস্থিরতা।

কিসের লোভ? পুরুষের সান্নিধ্য? কিন্তু জীবনের ছ'টা বছর ধরে স্বামী সাহচর্য কি নির্মলা পায়নি? তবে কি অজয়ের রূপ? রুচি? বিদ্যা? নির্মলার স্বামীও তো কম ভালবাসত না তাকে, আর অজয়ের মত পেলব, সুকুমার মুখশ্রী না থাকলেও, তার স্বাস্থ্য পৌরুষ নেহাত কম ছিল না। তবে?

এ তবের উত্তর নেই। সব জেনে-শুনেও কেন যে পুরুষ মজে, কেন যে মেয়েমানুষ মরে, কে বলবে।

আর মরছে যে সে-কথা বুঝতেই কি কম সময় লাগল। সেদিন ও-রকম বিশ্রী ব্যাপারটা না ঘটলে কোন দিনই কি বুঝতে পারত!

দুপুরের দিকে বিশ্রী রকমের ঝগড়া হয়ে গেল দাদার সঙ্গে। কেলেঙ্কারী আর কী, গরীবের ঘরে এ রকম প্রায়ই ঘটে থাকে।

গলগ্রহ হয়ে এদের সংসারে আছে, এমন সংসারে—যাদের নিজে-দেরই চলে না। খাওয়া-শোওয়া-বসা নিয়েও খোঁটা সইতে হয়। সেদিন দুপুরের দিকে বৌদি নির্মলাকে খাওয়াতে যে কত খরচ তাই নিয়ে একটা ইতর ইঙ্গিত করেছিলেন। নির্মলা সবে ভাতের থালা নিয়ে বসেছিল। সে-ও শক্ত রকমের একটা জবাব দিয়েছিল। এ সংসারে সে রীতিমত খেটে খায়,—যে বৌদি চিররোগা, মাসের মধ্যে বিশ দিন বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে চিঁ-চিঁ গলায় ফরমাশ চালায়, তার আবার এত কথা কেন! বাড়াবাড়ি এতটা হত না, মেয়েমানুষে মেয়েমানুষে এমন কথা কাটাকাটি হয়েই থাকে। কিন্তু দাদা পুরুষমানুষ, তিনি এর মধ্যে কথা বলতে এলেন কেন?

সেদিন আর খাওয়া হয়নি নির্মলার। ভাতের থালাতেই মুখ ধুয়ে উঠে এসেছিল।

সারাদিন মেজেয় আঁচল পেতে শুয়ে কাটাল। বহু দিনের মধ্যে ওপরের চায়ের আসরে গরহাজির হল সেই প্রথম। তারপর আস্তে আস্তে কখন বেলা গড়িয়ে গেল, তবু উঠতে ইচ্ছে করল না। চোচ দু'টো লাল, কেদে কেঁদেই নয়; ভিজে স্যাঁতসেঁতে মেজেয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু গায়ে শুয়ে থেকে গা হাত পা ব্যথা হয়ে গেছে। অল্প অল্প জ্বরও হয়েছে যেন।

পোড়া লোহা বিকেলের পর এতক্ষণে শঙ্খরব রোমাঞ্চিত সীসে সন্ধ্যা নেমেছে। আর শুয়ে থাকা চলে না। কিন্তু উঠেই বা করবে কী? মাথাটা এমন ভারি হয়ে আছে, আজ আর কোন কাজ করা অসম্ভব। ঝির ঝির হাওয়ায় শরীর হালকা হতে পারে ভেবে উঠে এল ছাতে।

আর সেই ছাতে তখনো যে অজয় পায়চারি করছে তা কি তখন জানত? অজয়কে দেখে ঘোমটা টেনে ফের নিচে নেমে আসবে বলে মুখ ফিরিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে অজয় একেবারে সামনাসামনি এসে দাঁড়িয়েছে।

—শুনুন!

মুখোমুখি পড়ে সমস্ত শরীর একবার কেঁপে উঠল নির্মলার। ভয় আর লজ্জা দুই-ই। এতক্ষণ ধরে যে কেঁদেছে তার দাগ রয়েছে সারা মুখের কোণায়। তবু সহজ ভাবে হাসবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে হল।

বললে, কি, বলুন।

—আজ চা খাওয়ার সময় যে বড় এলেন না? জানেন, আপনার জন্যে দু' দু' বার জল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?

—শরীর ভাল ছিল না।

—চা খেলে হয়ত ভাল হত; কিম্বা না হয় না-ই খেতেন, এলে দোষ ছিল কি?

—সিঁড়ি ভাঙতে ইচ্ছে করল না।

অজয় বললে, এতক্ষণে আপনি হাসালেন কিন্তু। একতলা থেকে ছাতটাই বুঝি বেশী কাছে হল। কৈফিয়ত একটু বুঝে শুনে দিতে হয়। অসুখটা মনে নয় ত? একটু থেমে আবার বললে, আমি সমস্ত শুনেছি। আজ ঝগড়া করেছেন আপনি।

ঝগড়া করেছি, আমি! শেষ পর্যন্ত অজয়ের মুখেও এই অভিযোগ। আর নিজেকে সংবরণ করা গেল না। সেইখানে, সেই শেষ পাখিটিও উড়ে-যাওয়া সন্ধ্যায় নির্মলা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। সেখানে সে যে একলা নেই এ খেয়ালও ছিল না।

আর সেই মুহূর্তে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, অজয় ওকে স্পর্শ করেছিল। লাজুক অজয়, ভীরু অজয়, এই সেদিন অবধিও যে ভালো করে তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস পেতো না, সে যে অকস্মাৎ এমন অঘটনঘটন পটীয়ান্ হয়ে উঠবে, নির্মলা অনুমানও করতে পারেনি। প্রথমে ধরেছিল একখানা হাত; একটু যদি মনের জোর থাকত নির্মলার, সহজেই ছাড়িয়ে নিতে পারতো নিজেকে। কিন্তু সারাদিন না খেয়েই হোক, আর মেজেয় কাঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই হোক, শরীরে এক ফোঁটা শক্তি ছিল না।

আর যে হাতখানি দিয়ে অজয় তার হাত ধরেছিল, সে হাতখানিও ত কাঁপছিল। সরিয়ে দিতে বুঝি মায়া হল।

—এ কী, আপনার জ্বর হয়েছে?

ততক্ষণে সমস্ত স্নায়ুগুলো একসঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। দীর্ঘ বৈধব্যের পাথর-চাপা বিস্মৃত, বিবর্ণ অনুভূতির তৃণগুলো আবার সরস স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে।

চিবুক ধরে ওর মুখখানি তুলে ধরেছিল, অজয়। তুমি কাঁদছ, নির্মলা?

তখন কাঁদতে গিয়ে হেসেছিল না হাসতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিল মনে নেই। সব ত ভুলে ছিল, ভুলে গিয়েছিল, প্রথম যৌবনে যে সুখ-স্বাদের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আজ তার ছিটে-ফোঁটাও ঠোঁটে-জিভে কোথাও লেগে নেই। সেই সর্বনেশে পিপাসার কথা আবার কেন অজয় মনে পড়িয়ে দিল। না কি, মনে ছিল বরাবরই, এত দিনের হাসাহাসি, মেশামেশি, চায়ের আসরে হাজিরা দেওয়ার ছুতোর এই একটাই মানে ছিল। এতদিন শুধু মেনে নেওয়ার সাহস ছিল না।

—কত জনের কত কথাই ত শুনতে হয়। তাই বলে কান্না? ছি! কিছু দ্বিধায়, কিছু বা অতিআগ্রহে অজয়ের আঙুলগুলো তখনো কাঁপছে। নির্মলার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেল, আর পায়ের নখ দিয়ে ছাতের সিমেণ্ট ঘষতে ঘষতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নির্মলা।

এ কী পাগল অজয়, একেবারে খোলা আকাশ, একেবারে হু হু বাতাস, তার মধ্যে এ কী!

আর লজ্জা নির্মলার নিজেরই যেন কত ছিল। নইলে একটুখানি ছোঁয়াতেই অমন করে কেউ গলে, না মিনিটের পর মিনিট ধরে আরেকটা মানুষের বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সেদিন অজয়কে কি বলেছিল নির্মলা! এ জীবন আর সহ্য হয় না? পরের দেওয়া অশ্রদ্ধার ভাত নামে না

গলায়। বৈধব্যও সয় কিন্তু সয় না এই গলগ্রহ নিজসত্তাহীন অস্তিত্ব।

আর পরম স্নেহে কপাল থেকে রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে অজয় ওকে আশ্বাস দিয়েছিল। এত ভেঙে পড়ছ কেন নির্মলা! সব ফুরিয়েছে মনে করলেই কি সব ফুরোয়? আবার শুরুও ত করা যায়। এখনো প্রাপ্য বুঝে নেবার সময় আছে। মেয়েদের স্বাধীন জীবিকার কত পথই ত হয়েছে আজকাল। ছোটখাট শিল্প শেখানোর অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যার কতগুলোর সঙ্গে অজয়ের নিজেরই জানা-শোনা! একটু যদি ধৈর্য থাকে, সাহস, আর আগ্রহ, তবে স্বাবলম্বী হতে কত দিন! এত বুদ্ধিমতী মেয়ে নির্মলা পারবে না।

এই অন্নদাসী জীবন পুইয়ে যাবে, এই রাতের পরেও আরেক ভোর আছে। অজয়ের কথাগুলো স্বপ্নে শোনার মত মনে হয়েছিল। অস্ফুট গলায় নির্মলা শুধু বলতে পেরেছিল, পারব। তুমি যদি পাশে থাক।

আরো কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কেটেছিল। শেষে নির্মলাই বুঝি এক সময় বলেছিল, চল এবারে নিচে যাই।

—চল।

আশ্চর্য, ওপরে ওঠার সময় শরীরটাকে এত ভারি মনে হয়েছিল, নিচে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় মনে হল পাখির মত হলকা। এমন সঙ্গীতময় অনুভূতি দেহে মনে কতদিন যে আসেনি নির্মলার। সারা দুপুরের কুৎসিত পারিবারিক কলহের কথা মন থেকে কখন ধুয়ে মুছে গেছে। মেজেয় আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকা শরীরেও গ্লানি নেই কোন।

গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুরের পটের সমুখে আনত হয়ে প্রণাম করেছিল নির্মলা ; নিজে থেকেই কখন উনুনে আঁচ দিতে বসেছিল। গুন গুন করে প্রিয় গানের একটা কলি গেয়েছিল কি না বলা যায় না।

অবাক বৌদি দরজার সামনে থেকে উঁকি দিলেন। খোনা গলায় বললেন, তোমার হল কি ঠাকুরঝি ? এত ফূর্তি হঠাৎ !

—ফূর্তি আবার কোথায় দেখলে বৌদি ?

—গুন গুন করে গান গাইছ কি না, মুখে হাসিও ধরে না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—ও কিছু না, কড়ায় তেল ঢেলে নির্মলা বললে, আজ সারাদিন খুব কেঁদেছি কি না বৌদি, তাই হেসে এখন শোধ তুলে নিচ্ছি।

বৌদি চলে যাবার পরেও আপন মনে আরো খানিকক্ষণ হেসেছিল নির্মলা। কেন এত হাসি, কি সে পেয়ে গেছে আজ, বৌদিকে বলা যাবে না। বৌদিকে কেন, কাউকেই না। কোন দিন না। অনেক তপস্যায় শেখা মন্ত্রের মত একে লালন করতে হবে সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, ছায়া-ঘরে বেড়ে ওঠা লতাটির মত। এ লতাতে কোন দিন ফুলও ধরে যদি, তবুও না। কাউকে জানাবার উপায় নেই কী সম্পর্ক তার আর অজয়ের। সমাজ প্রহরীর তর্জনী নিষেধোদ্ধত।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে নির্মলা উঁকি দিলে। ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা গেল অজয় আর করবী নেমে আসছে। আজ কি অসাধারণ সাজে সেজেছে করবী, পরনের শাড়ীটার রঙ কী কামনা ঘোর লাল। দরজা দিয়ে বেরুবার সময় করবীর চাপা গলার হাসি শোনা গেল।

মনে মনে অজয়ের বুদ্ধির প্রশংসা করল নির্মলা। নির্মলাকে ভালবেসেছে তাই বলে কর্তব্যবুদ্ধি জলাঞ্জলি দেয়নি। ভালই করেছে সে আজ করবীকে নিয়ে বেড়াতে গেল। এতে অন্তত কেউ সন্দেহ করার সুযোগ পাবে না।

বৌদি আবার কখন দরজার কাছে এসেছেন।

—ওরা বুঝি দু'জনে সিনেমা দেখতে গেল, রাতের শো'তে ? ফিস ফিস করে বললেন। তারপর নির্মলার জবাব না পেয়ে নিজের মনেই আবার : 'ওরা দু'টিতে বেশ আছে, না। কি সুখী !

টাকার চিন্তা নেই, ঝাড়া হাত পা, যখন খুশি ত্ব'টিতে মিলে হাত ধরাধরি করে বেরুচ্ছে !'

আর সঙ্গে সঙ্গে নির্মলার মুখখানা ছাই হয়ে গিয়েছিল। কল্‌জের ওপরে হাতুড়ির ঘা পাড়ছে যেন। এদিক্‌টা ত তার খেয়াল হয়নি। অজয়ের ভালবাসা সেও ত পেয়েছে, সুখী সেও। কিন্তু তবু তফাতও কত! করবীর সুখ পাত্র ছাপিয়ে উপ্‌ছে পড়ছে। লুকোচুরি নেই। সে সুখ সকলকে দেখিয়ে ভোগ করার।

গভীর দীর্ঘশ্বাসে বুকের ভেতরটা যেন নির্মলার ফাঁকা হয়ে গেল। এ অধিকার তার নেই। অজয়কে জনস্বীকৃতির রাজসড়কে পাওয়ার উপায় কই। প্রতিটি মিলনক্ষণের জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হবে। সকলকে লুকিয়ে, হাজার পাহারাফাঁকি দেওয়া নিরালোক গলিতে। কোন দিন কি অজয় তাকে নিয়ে এমনি ভাবে বেরিয়ে যেতে পারবে, আজ করবীকে নিয়ে যেমন গেল ?

নির্মলা সেদিন গভীর রাত অবধি নিঃসঙ্গ বিছানায় ছটফট করেছে। এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, বারোটা বাজল, সব কলরব এখন স্তিমিত। খানিক পরে অজয় আর করবী ফিরে আসার ভাঁজও পেল। সিঁড়িতে চাপা গলার সেই হাসাহাসি।

সমস্ত শহরটা ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ হয়ে যেন মরে এসেছে। নির্মলা তবু ঘুমুতে পারেনি। সারা রাত্ত বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বিছানার চাদরের ওপর তর্জনী দিয়ে লিখেছে—

অজয়, তোমাকে প্রণাম করি। আমাকে আজ তুমি আত্মবিশ্বাসী জীবনের ঠিকানা জানিয়েছ। শুধু তাই নয়, ভালও বেসেছ। এ কথা আর কেউ জানবে না। জানাতেও পারব না। এই বিত্ন্যদ্ময় সুখ বেদনা একান্তই আমার।

কিন্তু সব ত ত্ব'দিনেই ফুরাল।

অজয় তার কথা রেখেছিল। নির্মলার কাছে সে শুধু তার গোপনচারী প্রণয়ের অর্ঘ্যই নিবেদন করেনি, নির্মলা যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সুযোগ পায় তার সব রকম সুযোগ করে দিয়েছিল। একটি নারীকল্যাণ আশ্রমে সেলাই শেখানোর ভার পেয়েছে নির্মলা। বিনিময়ে নানা রকম টুকিটাকি, হাতের কাজ শিখছে। বাজার মন্দা, তাই এখনো পুরোপুরি নিজের খরচ নিজে যোগানোর সামর্থ্য নির্মলা অর্জন করতে পারেনি। তবু যে একেবারে বসে খেতে হচ্ছে না, দাদার অভাবের সংসারে কিছু অন্তত সাহায্য করতে পারছে, এ গর্বই কি কম?

কতক্ষণ তন্ময় হয়ে ভাবছিল নির্মলা, বলা যায় না। সদরে কান্নার রোল উঠতে আবার সন্ত্রস্ত হয়ে বসল! করবীকে ওরা বুঝি গঙ্গা থেকে স্নান করিয়ে নিয়ে এল। এক একটি করে সব অলঙ্কার খুলতে হয়েছে করবীকে, মুছতে হয়েছে সিঁথির সিঁদুর গর্ব। ভাঙতে হয়েছে শাঁখা। একটি মাত্র মোটা থানে রচনা করতে হয়েছে দেহের প্রচ্ছদ।

আর বুঝি চেঁচাতে পারছে না করবী, গলা চিরে একটা গোঙানির মত শব্দ শুধু বেরুচ্ছে। শোবার ঘরের চৌকাঠটার ওপর বুঝি মাথা ঠুকছে এখন। ও ঘরে সে আর ঢুকতে পারবে না।

আজ আর করবীকে হিংসে করার মত কিছু নেই, অশনে বসনে সে একেবারে নির্মলার ধাপে এসে নেমেছে। তবু নির্মলার মনে হল, তবু করবীর শান্তি আছে, গলা ছেড়ে কাঁদবার অধিকার আছে। আর, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে না পেরে নির্মলার বুকের ভেতরটা খাক হয়ে গেল যে!

কাল থেকেই, নির্মলা জানে, করবীকে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি,

তার আসতে থাকবে অসংখ্য। কলেজে কলেজে, এখানে ওখানে, পাড়ার সমিতিতে তাকে সমবেদনা জানিয়ে প্রস্তাব গৃহীত হবে।

উনুনের আগুন কখন নিবে এসেছিল। রান্না শেষ। একখণ্ড পোড়া কয়লা কুড়িয়ে নিলে নির্মলা। তারপর যেমন করে আল্পনা দেয় তেমনি করে মেজেয় লিখতে লাগল—

'অজয়, আমার শেষবারের প্রণাম নাও। তোমাকে ওরা যখন নিয়ে গেল, তখনো দূর থেকে দেখেছি, সামনে গিয়ে পা দু'খানা বুকে চেপে ধরতে সাহস পাইনি। লোক জানাজানির ভয় এমন। দু'ফোঁটা চোখের জল যে ফেলব, সেই সুযোগই বা পেলাম কই? তাতে লোকে সন্দেহ না করুক, মনে করবে বাড়াবাড়ি। কাউকে জানাতে পারলাম না, আজ আমার কি গেল।

কিন্তু তা নিয়ে অভিযোগ করি না। খোলা আকাশের নিচে যেদিন প্রথম স্পর্শ করেছিলে, সেদিনকার সেই স্বপ্ন-রোমাঞ্চিত সন্ধ্যাটির পর আমার অসহ সুখের ভারও একাই ত বহন করেছি। এই দুঃসহ দুঃখও না হয় আমার একার।

বারান্দায় কার ছায়া পড়ল? বৌদি বুঝি আবার আসছে।

তাড়াতাড়ি ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে নির্মলা কয়লার লেখা মুছে ফেলল। কেউ না দেখে, কেউ যেন না জানতে পায়।

ধাত্রী

নিমন্ত্রিতরা একে একে বিদায় নিল। শেষ অতিথিটিকে রাস্তা অবধি পৌঁছে দিয়ে হরষিত যখন ফিরে এল, তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। দেখল, বীণা তখনও চেয়ারে ঠায় বসে। চোখ ছু'টো আধ বোঁজা, একটু একটু ঢুলছেও। নিঃশব্দে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে হরষিত আস্তে আস্তে চেয়ারটার পিছনে দাঁড়াল। খোঁপা থেকে আলগোছে একটা ফুল তুলে নিল।

চকিত চোখছু'টি মেলে তাকাল বীণা। লজ্জিত গলায় বললে, আবার কেউ এসেছে নাকি।

—আর কেউ আসবে না। চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে বসল হরষিত। তোমার খুব ঘুম পেয়েছে বুঝি।

বীণা হাই তুলল একবার, তারপর আলস্যে চেয়ারের পিঠের ওপর রাখা হরষিতের হাতের ওপর মাথাটা এলিয়ে দিল। ঘুম? না। বোধ হয় ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। এবার এই ফুলের সাজগুলো খুলি?

—কষ্ট হচ্ছে? খোল তবে। আজ সারাদিন তোমার খুব পরিশ্রম হল, না?

—পরিশ্রম আর কী। এর চেয়ে ঢের বেশী খাটুনির অভ্যেস আছে আমার। এত শুধু চেয়ারে বসে থাকা। হাসপাতালে নাইট ডিউটি ত কম দিইনি। বীণা অল্প হাসল।

—এও কম শাস্তি নয়। এক ঠায় বসে থাকা, সবাইকে হাত তুলে নমস্কার করা; হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করা। কথা বলতে হবে, অথচ কেউ প্রগলভ না মনে করে।

—পাশ করেছি ত। স্মিত, উৎসুক মুখে প্রশ্ন করলে বীণা। আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল হরষিত। খোঁপা থেকে তুলে নেওয়া ফুলটি দিয়ে বীণার গালে একটা টোকা দিয়ে বললে, করেছ। এবারে এস।

পালঙ্কের ওপর বিস্তীর্ণ শয্যার দিকে তাকিয়ে বীণা কেঁপে উঠল। শিয়রের কাছে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা, ধবধবে মসৃণ চাদর।

—কী ভাবছ, জিজ্ঞাসা করলে হরষিত।

—কিছুনা। অপ্রতিভ বীণা আরেকটু সন্নিহিত হয়ে এল। যা ভাবছিল তা বলা যায়না। অত্যুগ্র আলোয় ধোওয়া ঘরখানাকে কখন থেকে কেবলি মনে হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারের মত। আর রজনীগন্ধার সৌরভের সঙ্গে ডিস্‌-ইন্‌ফেক্‌ট্যাণ্ট লোশনের একটা অদৃশ্য সাদৃশ্য আছে।

একে একে ফুলের সাজগুলোকে উন্মোচন করলে। সাধারণ একটা শাড়ি-ব্লাউজ নিয়ে বীণা বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দেখল, হরষিত আজকে-পাওয়া উপহারগুলোকে দেখছে আর গুছিয়ে তুলছে।

উপহার আর কী। বেশির ভাগই বই,—কবিতার। একটু দুঃসাহসী যারা, তারা দিয়েছে যৌনবিজ্ঞানের বর্ণপরিচয় জাতীয় দু'একটা সচিত্র বেস্‌ট্‌সেলর। আর আছে আইস-ক্রীম সেট, ফুলদানি, সবই মামুলি।

আর, ছোট্ট একটা দোলনায় শোয়ানো পাশাপাশি তিনটে ডল। এটা বুঝি বন্ধুদের দেওয়া। পিন দিয়ে আঁটা কার্ডে লেখাঃ শেপ্‌ অব্‌ থিংস টু কাম।

এটাও পুরোন রসিকতা, সব বিয়েতেই বন্ধুরা দেয়। নিজেরাই হাসাহাসি করে। ক'নে বৌয়ের কান দু'টি লাল হয়, মাথা নুয়ে পড়ে কিন্তু বীণা ক'নেও নয় এমন কিছু কচিও নয়। হাসপাতালে চাকরি করেছে ছ'বছর। কমসেকম দু'শো ডেলিভারি কেস ত সে অ্যাটেণ্ডও করেছে। আজ পঁচিশ বছর বয়সে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে বলেই কি অহেতুক লজ্জাকে আমল দেবে।

—কী দেখছ। হরষিত জিজ্ঞাসা করল।

—কিছু না। এগুলো আলমারিতে তুলে রাখি।

—কাল সকালে রাখলেও চলবে। হরষিত বললে, এখন এস।

একটু-ভাঁজ-না-পড়া ধব্‌ধবে চাদরটার দিকে তাকিয়ে আরেকবার কেঁপে উঠল বীণা। এসেন্স আর ক্লোরোফর্মের গন্ধ কি হুবহু এক। আশ্চর্য!

নিস্তেজ-নীল একটা আলোয় সারা ঘরটা এখন নিবুনিবু। হরষিতের সাগ্রহ একখানা হাত ওর বাহুমূল স্পর্শ করেছিল, বীণার মনে হল, সে হাতখানা যেন অকস্মাৎ শিথিল হয়ে গেছে।

—কী ভাবছ।

—কিছু না।

—আমি জানি কী ভাবছ। একটুখানি হাসি খেলে গেল বীণার মুখে।—ভাবছ প্রথম বারের কথা।

হরষিতের চোখের মণি দু'টি চমকে উঠল। বললে, না। ভাবছিলুম খোকা কাঁদবে কিনা।

---না কাঁদবে না। বীণা বললে, অনেকটা দুধ দিয়েছি ফীডিং বোতলে করে। ঠাকুরঝি ওকে ঠিক রাখতে পারবে।

—ও যে বাঁচবে, বীণার কাঁধে একখানা হাত রেখে হরষিত বললে, আমি আশা করিনি।

বীণা অল্প একটু হাসল। পুরুষ মানুষগুলো এমনিতে এমন গোঁয়ার, অথচ আসলে কত যে নার্ভাস, সেটা এই ক'বছর হাসপাতালে কাজ করে ওর জানতে বাকি নেই। বিক্রমের অবধি নেই, স্ত্রীর অসুখে একেবারে হাওয়া-লাগা মুড়ির মত মিইয়ে যাবে। কতবার ডেলিভারি কেসের সময় দেখেছে, স্বামীগুলো বারান্দার এ পাশ থেকে ওপাশ অবধি চষে ফেলেছে, কিম্বা শীতের রাত্রেও ভিজিটর্স রুমে জড়সড় হয়ে বসে আছে। নার্স ঘরে ঢুকলে আলোয়ানের ফাঁক দিয়ে মিটি মিটি চোখে তাকিয়েছে। যেন খুনে আসামী ফাঁসির হুকুমের অপেক্ষায় আছে।

অভয় দিয়ে নার্স বলেছে যদি, আজ বাড়ি যান, আজ কিছু হবে না, বিশ্বাস করেনি। নির্বোধ চোখে চেয়ে নির্জীব গলায় বলেছে,

সত্যি বলেছেন আজ কিছু হবেনা ? কোন ভয় নেই ? ও এখন কী করছে ?

—ঘুমুচ্ছে। নার্স হেসে বলেছে, আপনি বাড়ি যান।

হরষিতের কথায় আবার চমক ভাঙলোঃ খোকার তুমি যত্ন করো বীণা। ও যেন কোনদিন বুঝতে না পারে ওর মা নেই।

গ্রীবা ভঙ্গিমা করে বীণা বললে, করব গো করব। খোকার কথা ভেবে ভেবে তোমার আর ঘুম হবেনা দেখছি !

এইবারে বীণাকে প্রবল আবেগে আকর্ষণ করলে হরষিত। কানের কাছে মুখ নিয়ে ধরা-ধরা গলায় বললে, এমনিই কি আজ ঘুম হবে।

ঘুম তবু হয়েছিল কিন্তু। বীণা যখন জেগে উঠল, তখনো অন্ধকার। আকাশে তখনো তারা ছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রাস্তার গ্যাসের আলো নেবেনি। কত রাত এখন। হাতড়ে হাতড়ে শিয়রের নীল আলোর সুইচ টিপলে। হরষিতের মাথাটা বালিশ থেকে একটু সরে গেছে। একখানা হাত এখনো বীণার শরীরের ওপর ন্যস্ত। একটু শিউরে উঠল বীণা, শ্লথ পরিধেয় সংবরণ করে উঠে বসল। একগ্লাস জল খেতে হবে। এতক্ষণ যেন আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, এবারে সবটা বোঝা যাচ্ছে। সিটাডেল হাসপাতালের নার্স নববধূ হয়েছে।

জল গড়িয়ে খেয়ে বীণা বিছানার দিকে তাকাল। চাদরটা তেমনি ধব্‌ধবে, কিন্তু এলোমেলো হয়ে গেছে। বালিশগুলো এখানে ওখানে, একটা পাশ বালিশ পায়ের কাছে, আরেকটা খাট থেকে মেজের দিকে ঝুলছে। এখন আর বিছানাটাকে অপারেশন টেবিলের মত মনে হচ্ছে না, আশ্চর্য। হাতের কনুইয়ে, কণ্ঠাস্থির কাছে, গোটা কতক থেঁতলানো ফুলের পাপড়ি। খোঁপার নিচে ঘাড়ের কাছেও গোটা কতক আছে বুঝি। সাদা পাপড়ি। এগুলো রজনীগন্ধা। আর এই লাল ফুলগুলোর নাম কী ?

আলমারিটার দিকে তাকাতে চোখে পড়ল সন্ধ্যাবেলা পাওয়া উপহারগুলো। মোমের পুতুল তিনটে কি রকম মিটমিট করে চেয়ে আছে দেখ। ওদের গলায় বন্ধুদের লেখা সেই কার্ডটা ঝুলছে। থিংস টু কাম? ওই রকম তিনটে ছেলে হবে নাকি বীণার। ওমনি টুকটুকে? বিয়ে যখন হয়েছে তখন ছেলেপুলে ত হবেই। এতে লেখালেখির কী আছে বাপু। হাসপাতালের নার্স যদি পঁচিশ বছর বয়সে নববধূ হতে পেরেছে, কড়া কারচিফ খসিয়ে মাথায় তুলতে পেরেছে ঘোমটা, তখন, তিনটি নাহোক দু'একটি ছেলেপুলের জন্যেও তৈরি থাকতে হবে বৈকি। স্বামী পুত্র নিয়েই ত সংসার। অনেক লোকের মাইনে-করা সেবিকা থেকে একটিমাত্র মানুষের বিনেমাইনের সেবিকা হবে, বিয়ে করা মানে ত মোটে এইটুকুই নয়। ঘর থাকবে, ঘরকন্না থাকবে, একটি দু'টি ছেলেপুলেও থাকবে বৈকি। ধাতৃত্ব থেকে মাতৃত্ব।

জানালা বন্ধ। তবু সকালের রোদ আর পাশের বাড়ির উনুনের ধোয়া ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে কেমন ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে দেখ। হরষিতের ঘুম ভেঙেছে। মিট মিট করে তাকাচ্ছে এদিকে। বীণা অল্প একটু হেসে প্রত্যুত্তর দিল।

খেয়ে উঠে হরষিত বেরিয়ে গেল, কিন্তু বীণার দিন আর কাটে না। খোকাকে স্পঞ্জ দিয়ে মুছিয়ে সাজিয়ে দিল; খাইয়ে ঘুম পাড়াল। এবার?

এবার বিশ্রাম। খেয়ে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে হাসপাতালে দৌড়তে হবে না। জ্বরের চার্ট দেখতে হবে না, বায়না শুনতে হবে না অবুঝ, নাছোড় রুগীর। হরষিত বেরিয়ে গেছে, ফিরবে সেই বিকেলে, ততক্ষণ বিছানায় গা ঢেলে আয়েশ কর।

গোটা তিনেকের সময় বীণা উঠল। ঘর দোর টেবিল সব একটু গুছিয়ে রাখা যাক। ফুলঝাড়ু দিয়ে পরিপাটি করে পাতল বিছানা। পাখার গায়ে ঝুল জমেছিল, সেটাকে পরিষ্কার করলে।

টেবিলের কাগজপত্র সব তুলে ঝেড়ে পুঁছে আবার সুবিন্যস্ত করে রাখলে। টেবিলের টানার চাবি ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য সেটা ধরে একটু টানতেই বেরিয়ে এল। সেখানেও কাগজ-পত্রের জঞ্জাল। হয়ত গোপনীয় কাগজপত্র, হাত দেবে কি দেবে না, ইতস্তত করছিল, কিন্তু নিচে থেকে একটা ফটো উঁকি দিচ্ছে দেখে লোভ সামলাতে পারল না। দেখাই যাক না, কী।

পুরোন ছবি। বোধ হয় তিন চার বছর আগে তোলা। এক সময় বাঁধান ছিল, এখনো ফ্রেমের দাগ মেলায়নি। হরষিত আর—

আরে এ মেয়েটিকে ত সে চেনে। সাত দিন ধরে হাস-পাতালে এই শান্ত কোমল মেয়েটির বেদনাবিকৃত মুখচ্ছবি দেখেছে ; তারপর সেই বিকৃতি মিলিয়ে গিয়ে মুখটা ঠাণ্ডা নিথর হয়ে গেছে, তাও

হরষিতের প্রথম স্ত্রী বাসন্তী। চেনা মুখ, তবু আরেকবার দেখবার জন্যে বীণা ঝুঁকে পড়ল। বৈশিষ্ট্য কিছু নেই, তবু মেয়েটি মন্দ ছিল না দেখতে। চোখ দু'টি টানা না হোক, গভীর। ঠোঁটের নিচে চিবুকের ভঙ্গিটিও সুন্দর। হরষিত কি ভালবাসত বাসন্তীকে ? বাসত আবার না! যে ক'দিন বাসন্তী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল, কী দৌড়ঝাঁপটাই না হরষিত করেছে। দুপুর বেলাটা অফিসের বদলে কাটিয়েছে ভিজিটর্স রুমে। প্রহরে প্রহরে ফোন করে করে অস্থির করে তুলেছে। যেদিন সব শেষ হয়ে গেল, সেদিন কী ভীষণ সাদা হয়ে গিয়েছিল হরষিত, বীণার মনে আছে। অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হয়ে বসেছিল মাথায় হাত দিয়ে। তারপর চোখে রুমাল তুলেছিল।

—আসব বৌদি ?

চকিত হয়ে বীণা ফিরে তাকাল। বললে, এস কিরণ।

খোকাকে কোলে নিয়ে কিরণ ঘরে ঢুকল। হরষিতের খুড়তুতো বোন, বীণার সমবয়সী। সাত আট বছর বিয়ে হয়েছে।

এরি মধ্যে বেশ গিন্নীবান্নি হয়েছে কিরণ, আয়েশী গড়ন এসেছে শরীরে।

বীণার কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কিরণ জিজ্ঞাসা করল, কী দেখছ বৌদি? ও, দাদা আর আগেকার বৌদির ফটো। বিয়ের পরই পুরী গিয়ে তুলেছিল।

পুরী? বীণা জিজ্ঞাসা করল, বিয়ের পর ওরা পুরী গিয়েছিলেন বুঝি।

—বাস্‌রে, গিয়ে অনেক দিন ছিল যে। দাদা একমাস ছুটি নিয়েছিল। হনিমুন, জান না?

অল্প একটু হাসল বীণা। সেবারে একমাস ছুটি নিয়েছিলেন, আর এবারে বুঝি বৌভাতের পরদিনই অফিসে ছুটতে হল ঠাকুরঝি? একটা দিনের ছুটি নিতেও পারলেন না।

—বাঃ রে, কিরণ বললে, তখন দাদার ছিল অল্প বয়স, তা' ছাড়া প্রথম বিয়ে।

—তোমার দাদার এটা না হয় প্রথম বিয়ে নাই হল ঠাকুরঝি, কিন্তু আমার ত এই প্রথম? বীণা আস্তে আস্তে বলল।

মনে সামান্য যেটুকু তিক্ততা জমেছিল, বিকেলের দিকে তা রইল না। কিরণ আজ সন্ধ্যাবেলায় যাবে। ওঁর নিজেরও সংসার আছে। হরষিত অফিস থেকে ফিরেছিল। খোকা? খোকার কী হবে।

—খোকাকে সঙ্গে নিয়ে যা তুই,.হরষিত বললে! নিয়ে যেতে কিরণ ত খুবই রাজি। সেখানে আরো পাঁচটা কাচ্চাবাচ্চা আছে। স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না হোক, খোকাকে দেখাশুনা করার লোকের অভাব হবে না।

পিছনে দাঁড়িয়ে ভাইবোনের আলাপ শুনছিল বীণা। এগিয়ে এসে খোকাকে কোলে তুলে নিল। শান্ত গলায় বলল, তা হয় না ঠাকুরঝি। খোকা এখানেই থাকবে। ওকে আমিই মানুষ করব। আমিও ত ওর মা?

কিরণ আড়ালে যেতে হরষিত বীণার হাত দু'টি চেপে ধরল। সত্যি তুমি পারবে?

বীণা হাত দু'টি ছাড়িয়ে নিল না, শুধু জিজ্ঞাসা করল, কী পারব?

—খোকাকে মানুষ করতে?

পারব না কেন, তুমি কি ভেবেছ, সৎমা বলে হিংসা করব?

অপ্রতিভ, মুগ্ধ হরষিত বললে, তা নয়,···আমি জানি, তুমি পারবে। ওসব সেকেলে ইতরামো তোমার মধ্যে নেই। তা হলে মানাকেও নিয়ে আসি?

মানা হরষিতের প্রথম মেয়ে। বিয়ের আগে তাকে হরষিত মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিল। বীণা বললে, আনবে বৈকি। সে কি চিরকাল মামাবাড়ি থাকবে।

খাটের সঙ্গে আরেকটা তক্তপোশ জোড়া হল। ছোট একটা তোশক পাতা হল। তার ওপরে অয়েল ক্লথ। ওখানে খোকা শোবে।

কিরণকে পৌঁছে দিতে গেল হরষিত, বীণা খোকাকে ঘুম পাড়াতে বসল। বিছানায় ঘুমোবে না খোকা, বীণা ওকে কোলে তুলে শুইয়ে দিল। এই খোকাকে নিয়েই হরষিতের সঙ্গে ওর পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা।

বাসন্তীর মৃত্যুর পর একদিন হাসপাতালে এসেছিল হরষিত। উস্কখুস্ক চুল, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি। বীণাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তখন মাথার গোলমালে আপনাদের এখানকার পাওনা সব চুকিয়ে দিতে পারিনি। চাকর-দারোয়ানদের এই টাকাটা ভাগ করে দেবেন, আর—

আর কী?

একটু যেন ইতস্তত করল হরষিত, তারপর বলল, আপনি আমাদের···মানে ওর জন্যে অনেক করেছিলেন,···যদি কিছু মনে না করেন তবে···

বলতে বলতে ওর হাতের মধ্যে ছু'খানা দশ টাকার নোট গুজে দিয়েছিল হরষিত। বীণা সামান্য একটু চমকে উঠেছিল, কিন্তু টাকাটা ফিরিয়ে দিতে হাত সরেনি।

ছু' এক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছু'জন। শেষে আব-হাওয়াটা সহজ হতেই বীণা জিজ্ঞাসা করেছিল, খোকা কেমন আছে।

—বেঁচে আছে, জবাব দিয়েছিল হরষিত, তবে সেটাও কম কথা নয়, এ অবস্থায় সাধারণত বাচ্চাকে বাঁচানো কঠিন হয়। একটা দাই রেখেছি, কিন্তু তার ওপর সব ফেলে আসতে ভরসা পাইনে। একজন ট্রেইণ্ড্ নার্স পেলে ভাল হত বলে, এক মূহূর্ত অপেক্ষা করেছিল হরষিত, তারপর জিজ্ঞাসা করেছিল, আছে নাকি আপনার জানাশোনার মধ্যে তেমন নার্স।

হরষিত নার্সের খবর জিজ্ঞাসা করল বটে কিন্তু ওর দৃষ্টির আকৃতি থেকে বীণা কি আর বোঝেনি, হরষিত অন্য কোন নার্সের খোঁজ চাইছে না, চাইছে বীণাকেই। যে ক'দিন বাসন্তী এখানে ছিল, সে ক'দিন বীণার সঙ্গে তার একটা সখিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, শুধু মাত্র প্রাণহীন দেনাপাওনার নয়। বীণা গেলে হরষিত যতটা নিশ্চিন্ত হবে, অন্য কোন ধাত্রী পেলে ততটা নয়।

—আমি গেলে চলবে? সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিল বীণা।

—আপনি,···আপনি যাবেন? হরষিতের চোখ ছুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।—তা হলে কী যে ভাল হয়।

—বেশ, আমি তা'হলে মাঝে মাঝে যাব। তবে বেশী সময় ত দিতে পারব না, আপনি দাইটাকে হাতছাড়া করবেন না।

হরষিত ঠিকানা দিয়ে চলে গেল।

প্রথম যেদিন এ বাসায় এসেছিল, বীণা বিশ্বাস করতে পারেনি এখানে কোন মানুষ বাস করতে পারে। কী ছিরি ঘরদোরের। এখানে জঞ্জাল, ওখানে এঁটো বাসন, তক্তপোশের নীচে জড়ো করা ময়লা কাপড়ের স্তূপ। একটা স্টোভের আওয়াজ হচ্ছে রান্নাঘরে।

উঁকি দিয়ে দেখলে হরষিত রান্না করছে আর তার বড় মেয়ে মানা পাশে চুপ করে বসে আছে। সারা ঘরময় তরকারির টুকরো ছড়ানো।

—খুকির হাত কাটল কী করে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতের দিকে তাকিয়ে বীণা জিজ্ঞাসা করল।

—তরকারি কুটতে গিয়ে। হরষিতের চোখ হু'টি চকচক করছে, ধোঁয়ায় না নিজের ভাত নিজকে ফুটিয়ে নিতে হচ্ছে এই ছঃখে, বোঝা গেল না।

—আপনার কী আক্কেল, ওই চার বছরের মেয়েকে আপনি বটি দিয়ে তরকারি কুটতে দিলেন ?

হরষিত একটু হাসল।—আমি তখন ভাতের ফেন গালছিলুম যে। দেখছেন না, আমার পায়ের পাতা পুড়ে গেছে। বলে বীণাকে পায়ের পাতার ওপর বড় রকমের একটা ফোস্‌কা দেখালে।

—বাড়িতে রাঁধছেন কেন, কোন হোটেলে বন্দোবস্ত করতে পারেন না। রান্না করবার একজন লোক রেখে দিলেই ত পারেন। নানা রকমের প্রশ্ন করেছিল বীণা, পরামর্শ দিয়েছিল।—কিম্বা এমন কোন আত্মীয়া নেই, যিনি এসে দেখাশুনা করতে পারেন ?

—কেউ নেই। বরাবরের মত কে তার সংসার ফেলে আসবে বলুন। আর হোটেল ? সে অনেক খরচার ধাক্কা। পাই ত মোটে শ'হুই টাকা। দাইয়ের মাইনে, হোটেল খরচা এত যোগাব কোথা থেকে। আপনাকেও ত—হরষিত কপালের ঘাম মুছে বললে,—একটা ফী দিতে হবে।

হুপুরে হরষিত বেরিয়ে যেতে বীণা ঘরদোর নিয়ে পড়ল। বাচ্চাটা মোটামুটি লক্ষ্মীই হয়েছে, বেশি চেঁচামেচি করে না। সেই অবসরে বীণা ঘরের ঝুল পরিষ্কার করলে। তক্তপোশের নিচে থেকে ছাড়া ধুতি-গেঞ্জিগুলো বার করে একটা হিসাব লিখলে। এগুলো ধোপাবাড়ি পার করতে হবে। হরষিতের বড় খুকি ওর পেছনে

পেছনে বিস্মিত, বিস্ফারিত চোখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্বল্পায়াসসাধ্য দু' চারটে ফরমাশ খাটছেও।

—তোমার নাম কী খুকি।

—মানা। খুকী জবাব দিলে।

— বাঃ বেশ নাম ত।

—খু-উব ভাল নাম, খুকি বললে।

একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলে, আর ভাইয়ের নাম কী?

—রাণা। ঝোঁকের মাথায় কথাটা মুখ থেকে ফসকে গেল বটে, কিন্তু নামটা বীণার মন্দ লাগল না। মানার ভাই রাণা।

প্রায় তিন মাস হরষিতের বাসায় মাইনে করা ধাত্রীর কাজ করেছে বীণা। পেত ত মোটে পঁচিশটি টাকা। টাকার জন্যে যতটা পরিশ্রমের দরকার, তার চেয়েও ঢের বেশি করেছে। মানাকে অক্ষর পরিচয় করান থেকে হরষিতের জামার ছিঁড়ে যাওয়া বোতাম লাগানো অবধি। কাজ সারা হয়ে যাবার পরও যদি হাসপাতালে ডিউটির তাড়া না থাকছে তবে চা খেয়েছে। নানা কথা বলেছে। হরষিত ওর অদৃষ্টের বিড়ম্বনার কথা, বীণা বীণার। মা-মরা দু'টি শিশুকে মানুষ করে তোলার যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে ওদের মধ্যে বিচিত্র একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

আশ্চর্য, তিন মাস ধরে প্রতিদিন দু'জনের দেখাশোনা হয়েছে, অথচ ঘুণাক্ষরেও কারুর মনে হয়নি, একে অপরকে ভালবাসে। পছন্দ যে করে, এটুকু বুঝতে অবশ্য দেরি হয়নি।

মানা আর রাণাকে নিয়ে হরষিত যখন বিব্রত, সেই মুহূর্তে হয়ত এসেছে বীণা। হরষিতের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

—বাঁচা গেল। আপনি এলেন।

কিম্বা—

…আজ এত দেরি।

বীণার কিন্তু কখনো মনে হয়নি এটা সহজ কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়া আর কিছু। বলতে কি, এই আর কিছুর অভিজ্ঞতা বীণার বিশেষ

ছিলও না। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে মানুষ। বয়স যখন হল, তখন বয়স হয়েছে এই লজ্জাতেই সকলের চোখের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াত। চেহারার দিক থেকেও বিধাতা বিশেষ সুবিচার করেন নি। উপযাচকেরা কখনো কিউ দিয়ে দাঁড়ায়নি।

ইতিমধ্যে ধাত্রী-বিদ্যাটা আয়ত্ত করেছিল,হাসপাতালের চাকরিটা জুটে গেল। আঠারো থেকে পঁচিশ, এই সাত-আটটা বছর একটানা কেটে গেল, অপারেশন টেবিলের পাশে মুখোশ মুখে ; মুমূর্ষুর কাতরানি আর নবজাতকের কাকলি শুনে ; ডিস্-ইন্ফেক্-ট্যাণ্ট লোশনের গন্ধ ছাপিয়ে রজনীগন্ধার গন্ধ কখনো নাকে এসে পৌঁছল না। কঠিন, নির্জীব রুটিনের চাপে মাঝে মাঝে শরীরে অবসাদ এসেছে, মন চঞ্চল হওয়ার সুযোগই পায়নি। ছোক্‌রা দু'চারজন ডাক্তারের চোখের ইঙ্গিতে গা জ্বলে গেছে। দু'চারজন অ্যামেচার বদমাশ ফোন গাইড্ দেখে নাম খুঁজে বার করে মাঝরাতে টেলিফোন করে করে জ্বালিয়েছে। পেশাদার দু'চারজন কাপ্তেন গভীর রাত্রে ট্যাক্সি নিয়েও মাঝে মাঝে এসে নার্স কোয়ার্টারের সমুখে হর্ন বাজিয়েছে। এসবই গা-সওয়া হয়ে এসেছিল।

এরা ছাড়া হরষিতই বোধ হয় প্রথম পুরুষ যার সঙ্গে বীণা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশল। অবশ্য রোজ দেখাশোনা হওয়ার নামই যদি ঘনিষ্ঠতা হয়। এর যে অন্য কোন মানে হয়, এ থেকে যে আর কিছু আসতে পারে, যতদিন না ডক্টর সমাদ্দার ডেকে কথাটা বললেন, ততদিন মনেও হয়নি।

হরষিতের বাসায় বীণা যাওয়া-আসা করে, কথাটা সত্যি কিনা ডাঃ সমাদ্দার জানতে চাইলেন।

বীণা প্রথমটা একটু দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু কথাটা অস্বীকার করতে পারল না।

—কেন যাও ?

—ওঁর ছেলেকে দেখাশোনা করি যে।

—টাকা নাও ?

বীণা স্বীকার করলে টাকা সে নেয়।

—জান এটা হাসপাতালের নিয়ম বিরুদ্ধ। এখানকার হোল্‌টাইম কোন কর্মচারীর আউট-ডোর প্র্যাক্‌টিস করবার নিয়ম নেই। শুধুমাত্র এই অন্যায়ের জন্যেই তোমাকে আমি বরখাস্ত করতে পারতাম। যাক্‌, এবারে তোমাকে শুধু ওয়ার্নিং দিচ্ছি। তুমি ও কাজটা ছেড়ে দাও।

চা খেতে খেতে বিকেলে বীণা হরষিতকে বললে, আজ আমার শেষ দিন।

—শেষ দিন ? কেন ? হরষিত জিজ্ঞাসা করলে। ওর হাতের কাপটাকে কেঁপে উঠতে দেখে বীণাও যেন কেঁপে উঠল। হাসপাতালের ব্যাপারটা হরষিতকে খুলে বলতে হল।

—কাল থেকে, বীণা ধীরে ধীরে বললে, আমি আর আসব না।

—কাল থেকেই ? বেশ! হরষিত উঠে দাঁড়াল, তারপর ড্রয়ার থেকে টাকা বার করে বললে, আপনার পাওনাটা চুকিয়ে নিয়ে যান।

টাকাটা হাত পেতে নিলে বীণা। এবার ওর হাত কাঁপার পালা।

—গুণে গুণে নিন। হরষিতের কঠিন কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে,—দেখে নিন। আজকাল আবার অনেক নোট ছেঁড়া থাকে।

শুধু হাত নয়, এবার চোখের পাতা দু'টিও কাঁপল বীণার। জলে ভরে উঠল। মাথাটা টেবিলের ওপর নুইয়ে দিল।

আর, সেই মুহূর্তে সব জানাজানি হয়ে গেল।

মিনিট পাঁচেক পর হরষিত বললে, হাসপাতালের কাজটা তুমি ছেড়ে দাও বীণা।

কথা বলতে গিয়ে কথা বলতে পারল না বীণা, ভিজে চোখ দু'টি তুলে স্থির চোখে তাকাল। হাসপাতালের কাজটা ছেড়েই দেবে।

মানা এল তিন দিন পরে। বীণাকে সে চিনত, কিন্তু এই বধূবেশে নয়। সন্দিগ্ধ চোখে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

বীণা ওকে কাছে ডেকে নিলে। কি মানা, চিনতে পারছ না? তোমাদের বাড়ি ফিরে এসেছি যে। আমি তোমাদের মা। নতুন মা।

মানা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বললে, ছাই মা।

কিন্তু মানাকে জয় করে নিতে বেশী সময় লাগল না বীণার। মানার একটা পুতুলের বিয়ের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের ভার নেবার পর দিন থেকে মানা এমন বশ হয়ে গেল বীণার, যে হরষিতের সুদ্ধ তাক লেগে গেল।

আগে বাইরে থেকে এসে এই সংসারের তদ্বির করতে হত, তাতে তৃপ্তি ছিল না; সব কাজ কেমন যেন আধসারা হয়ে থাকত। এবারে পুরো কর্তৃত্ব হাতে নিয়েছে বীণা। হিসেব করে বাজার খরচের পয়সা দেয়। প্রয়োজন ছাড়া সন্ধ্যার পর আলো জ্বলতে দেয় না: বাড়িতে কাচা সম্ভব হলে ধোপাবাড়ি জামাকাপড় যায় না।

সমস্ত ঘরদোর এখন গুছোন। তক্‌তক্‌ করছে।

হরষিত প্রীত সব চেয়ে। যখন দাড়ি কামাতে কামাতে খোকাকে সামলাতে হত, দু'ঘণ্টা রান্না ঘরের ধোঁয়ায় নাজেহাল হয়ে আধসেদ্ধ ভাতে ভাত আধপেটা খেয়ে আপিসে ছুটতে হত, সে-দিনগুলো দুঃস্বপ্নের সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে।

এমন কি খোকা-খুকুর সামান্য অসুখবিসুখ করলেও ডাক্তারের বাড়ি ছুটতে হয় না। ট্রেইণ্ড নার্স আছে বাড়িতেই।

কোমরে আঁচল জড়িয়ে বীণা যখন রান্নাঘরে ঢোকে, হরষিত মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। বাসন মাজা আর বাটনা বাটার জন্যে আছে একটা ঝি, বাকি কাজটা বীণা একাই করছে। আগুনের তাতে গলেনা, ঠাণ্ডা জল ঘাঁটলে অসুখে পড়ে না, কি শক্ত সমর্থ এই মেয়েটা।

বাসন্তীও শান্ত ছিল, কিন্তু এমন সংসারী ছিল না। যা পেত সব উড়িয়ে দিতে ভালবাসত। সর্দিতে ভুগত মাসে তিরিশ দিন ; ওষুধের দোকানের বিল মাসে নেহাত কম হত না। বোঝা-বোঝা জামাকাপড় যেত ধোপা-বাড়ি।

বলতে কি, সে সময় দু'শো টাকাতেই মাঝে মাঝে হালে পানি পাওয়া যেত না। দু' চার দশ টাকা ফী মাসেই ধার হত। প্রতিমাসেই দু' চার টাকা করে সে ধার বেড়েও চলেছিল।

আর বাসন্তী যখন হাসপাতালে. তখন হরষিতের কিছু ধার হয়েছিল আফিসে! শীগগির একটা ইন্‌ক্রিমেণ্ট পাওয়ার ভরসা ছিল বটে, কিন্তু ধার শোধ করে তাতেও কুলোবে কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় ছিল।

এখন আর কোন আশঙ্কা নেই। হরষিত জানে, বীণা চালিয়ে নিতে পারবে ঠিক। সংসার খরচের টাকা থেকেই বাঁচিয়ে সে এই একমাসের মধ্যেই জানালার পর্দা দু'টো বদলে নিয়েছে। আর মানার অসুখের সময় একটানা দিন রাত্রি শিয়রে জেগে ত অসাধ্য-সাধন করলে বীণা। আগেকার আমলে হলে ভিজিটে অষুধেই চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা বেরিয়ে যেত।

মাসে দু'শো টাকা উপার্জন, একটি সুগৃহিণী, আর দু'টি ছেলে-মেয়ে। জীবনের পরিমিত প্রয়োজন মেটাবার মত সংস্থান ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন। চারজনের পরিবারের হয়ত এতেই চলে যাবে। আর বেশি চায় না হরষিত। তাহলে কুলোবে না।

কিরণ এর মধ্যে একদিন বেড়াতে এসেছিল।

—বাঃ, বৌদি, বেশ গুছিয়ে তুলেছ দেখছি।

খোকাকে কোলে নিয়ে বীণা কাজল পরাচ্ছিল। একটু লজ্জিত হাসল শুধু।

একেবারে পাকা গিন্নী, না? ছিলে ত বাপু হাসপাতালে, এত সব শিখলে কোথায়?

—শিখতে হয় না ভাই, শেখাই থাকে!

—তোমার শরীরটা যেন একটু খারাপ দেখছি বৌদি?

কিরণ যে ওকে সন্ধানী চোখে খুঁটিয়ে দেখছে সেটা বুঝতে পেরে বীণা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। বলল, কই, না ত?

—আবার না কি! চোখের কোলে কালি, গাল শুকনো,—একি শুধু সংসারের খাটুনিতে। আমার চোখ কিছু এড়ায় না। আমার গা ছুঁয়ে বল বৌদি। ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বীণা হেসে ফেলল, দূর, তুমি যা ভাবছ তা নয়।

বিস্মিত হয়ে কিরণ তাকাল। এবারে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, সত্যি বলছ তোমার ছেলেপুলে হবে না?

—না, বললাম ত এখন হবে না। আর,—খোকাকে দেখিয়ে বীণা বললে, এরাই ত আমার ছেলে।

—সে ত বটেই। কিছু বোঝেন না যেন। তোমার নিজের ছেলেপুলের কথা বলছি গো, তোমার নিজের।

নিজের? কিরণ চলে যাবার পরও সেদিন বীণা কথাটা ভুলতে পারল না। রোজকার মতনই ঘর ঝাঁট দিল, কাপড় কুঁচিয়ে আলনায় তুলে রাখল, খোকাকে খাইয়ে ঘুম পাড়াল, খুকুকে সাজিয়ে পাঠিয়ে দিল পার্কে, কিন্তু কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারল না। এতদিন ভুলে ছিল এই আশ্চর্য। হাজার হলেও এরা তার নিজের নয়।

এতদিনে বোঝা যাচ্ছে, সব কিছু পেয়েও কেন একটা অপূর্ণতা-বোধ ছিল মনে। এদের যতই ভালবাসুক, নিজের রক্ত মাংস দিয়ে তৈরি যে সন্তান, তার প্রতি মমতার রঙই যে আলাদা। এ সংসারে এসে সবই পেয়েছে বীণা,—সিঁথির সিঁদুর, আঁচলে চাবি, পূর্ণ কর্তৃত্ব, কিন্তু মস্ত বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে কোন্‌খানে। আলমারিতে বন্ধুদের দেওয়া মোমের পুতুল তিনটের দিকে চোখ পড়তেই বীণা আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিল। সরে এল সেখান থেকে।

মশারির ধার গুঁজতে গুঁজতে বীণা বলল, আজ কিরণ ঠাকুরঝি এসেছিল।

—এসেছিল নাকি? কি বললে?

—কি আবার বলবে, নানান্ কথা। আমার চেহারা নাকি খারাপ হয়ে গেছে বললে।

—বললে নাকি? হরষিত বীণাকে টেনে নিল,—বলল, কিরণের চোখ নেই। তুমি বিয়ের পর অনেক সুন্দর হয়েছ।

আলোটা নিবিয়ে দিল বীণা। জানালা দিয়ে হালকা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ল বিছানায়। হরষিতের বাহুমূলে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলল, ছাই সুন্দর হয়েছি। জান, কিরণ বলছিল,—মেয়েরা—ইয়ে—হলে যেমন দেখায়, আমাকে নাকি দেখতে তেমনি হয়েছে।

—বলল নাকি। হরষিত হাসল খানিকটা। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে, লেখাপড়া বেশি শেখেনি, ও-ত বিয়ের ওই একটা মানেই জানে। ওকে বলেছ, আমরা ছেলেপুলে চাইনা বলেই হয় না? আজকাল অনেক উপায় আছে।

হরষিতের বুকে মুখ মিশিয়ে বীণা বলল, যাঃ, আমার লজ্জা নেই বুঝি।

একটু অপেক্ষা করে বীণা বুঁজে-আসা গলায় আবার বললে, আর, আজ হচ্ছে না বলে, কোনদিন হবে না তা' ত নয়। তখন কী বলব।

আস্তে আস্তে ওর কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিতে দিতে হরষিত বললে, দু'টি আছে তাই কুলোতে পারি না। এই রোজগারে আরো চাও?

হরষিতের বাহুপাশে বদ্ধ শরীরটা থরথর করে কাঁপছে বীণার। ঠোঁট দু'টি হরষিতের কানের কাছে নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, কিন্তু রোজগার ত তোমার বাড়বে। খোকাখুকুও বড় হবে। তখন?

মাথাটা একটু সরিয়ে নিল হরষিত, কিন্তু তখন তাদের মানুষ করে তোলার খরচও ত বাড়বে। দু'টি ত বেশ আছে। আর বেশিতে কাজ কী, বীণা।

হঠাৎ বীণার কী হল, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে বসল। সরে গেল বিছানার এক পাশে।—তাই বলে একটিও হবে না আমার? একটিও না?

কিছু বুঝতে না পেরে হরষিত খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। এক একটি শিশুকে খাওয়ানো, পরানো, লেখাপড়া শেখানর দায়িত্ব কী দুর্বহ, বাসন্তী জানত না। সে ছিল বেহিসেবী, জানতেও চাইত না। প্রথম বিয়ে, বয়স অল্প, হরষিতও তখন পরিণামের বিশেষ পরোয়া করেনি। তার ফল ভোগ করছে এখন।

বললে, আশা করেছিলাম, তুমি বুঝবে বীণা। মানা-রাণা এরা ত তোমারই।

—না, না, না। কী অদ্ভুত, তীক্ষ্ণ, নির্লজ্জ গলায় বলে উঠল বীণা। চীৎকারের মতো শোনাল।

সেই চীৎকারে রাণার ঘুম ভেঙে গেল। চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ওকে কোলে তুলে নিল বীণা, শান্ত করতে মুখে চুষিকাঠি পুরে দিলে।

আধ অন্ধকারে বীণার আবছা মুখখানার একাংশ শুধু দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভিত হরষিত জিজ্ঞাসা করল, কী হল তোমার, বীণা? কী ভাবছ?

বীণা ততক্ষণ শান্ত হয়ে পড়েছে। খোকাকে কোলে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে ঘুমপাড়ানি ছড়া গুন গুন করছে। হরষিতের প্রশ্নে তিক্ত ভঙ্গিতে ঠোঁটটা বাঁকালে শুধু। অদ্ভুত হাসল। অতি ক্লান্ত, নিস্তেজ গলায় বললে, কী আবার হবে। ভাবছি,—আমি সেই ধাত্রীই রয়ে গেলাম।

হরষিত আবার কী বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে বীণা বাধা দিল। চুপ। খোকা উঠে পড়বে।

গিল্টি

একটি যৌথ ব্যবসায় ফেল পড়ার কাহিনী লিখতে বসেছি।

শুরু করেও কিন্তু বুঝতে পারছি না এটা শেষ অবধি গল্প হবে কি না। দেখা জিনিস আর শোনা কথার ছাঁটকাট শেলাই করি, গল্প বলে চালাই। জিনিস তৈরী হয়ে গেলে কখনও কাপড়ের টুকরো বাঁচে, কোন কাজে লাগে না, কলের তু'ধারে জড়ো হয়, কিছু হাওয়ায় ওড়ে, কিছু ঝাঁট দিয়ে ফেলি, তু'এক টুকরো তুলেও রাখি যদি কোন দিন জোড়াতালির কাজে লাগে। এই লেখাটা মূলে তেমনি একটা কাপড়ের টুকরো, পরে দরকার হবে ভেবে তুলে রেখেছিলুম, আজও তোলা আছে। রঙ জ্বলে গেছে, বুনট জীর্ণ হয়ে এসেছে। পাছে সব যায় সেই ভয়ে এটাকে আজ নামিয়ে নিয়েছি। কলম নিয়ে বসেছি যেমনটি দেখেছি তেমনই লিখব বলে। এখনও সন্দেহ আছে, হয়ত লেখাটা বিবৃতিমাত্র হবে, বড় জোর ধাঁধা।

প্রথমে কার কথা লিখি, সীতার না সলিল বাবুর? তু'জনের মধ্যে সলিল বাবুকে আগে দেখেছিলুম, সুতরাং তাঁকে নিয়েই আরম্ভ করা যাক।

সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের সেই মেসটিতে আমাকে দেখে প্রথম দিন সলিল বাবু খুশি হননি। চিলেকোঠায় একলা থাকতেন, নতুন রুমমেটটিকে উৎপাতের মত মনে করেছিলেন। আপনাকে এখানে এনে ঢুকিয়েছে বুঝি? ম্যানেজার ব্যাটা দেখছি সব ভরে ফেলতে চায়, তু'দিন বাদে মাছি বসবার জায়গাটুকুও থাকবে না। তা মহাশয় কি টেম্পোরারি, না একেবারে পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট করে এলেন?

বললুম, টেম্পোরারি। রেলের চাকরি, আমিনগাঁও থেকে

বদলি করেছে লখনৌ। মাঝখানে কিছু দিন কলকাতা থাকতে হবে।

বললেন, ও! বুঝলুম নিশ্চিন্ত হয়েছেন। হয়ত প্রীতও, কেন না গামছা-কাঁধে নীচে নেমে গেলেন। খানিক পরেই কলতলা থেকে গুন্‌গুন্‌ গলা ভেসে এল, সুরটা চিনলুম, হে ক্ষণিকের অতিথি!

এ-সব পার্টিশনের অল্প কিছু দিন পরের কথা।

সলিল বাবুকে কিন্তু আমার ভাল লেগেছিল। কোট-পাতলুন পরে যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেন, মনে হত রীতিমত সুপুরুষ, চশমার নীচে চোখ দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত; খালি গায়ে খাটিয়ায় শুয়ে যখন বিড়ি টানতেন তখন আবার অন্য রূপ! লুঙ্গিটা ঢিলে করে অধমাঙ্গে কোনমতে জড়ানো, কোমরে কসির দাগ, শুকনো ঘায়ের মত, শ্বেতির ছিটের মত। পাঁজরার হাড় গোনা যায়। চশমাটা বালিশের পাশে খুলে রাখা, নিষ্প্রভ, ঈষৎপ্রোথিত চোখের কোলে কালি স্পষ্ট।

সলিল বাবু কী করতেন কখনও টের পাইনি। এক এক দিন সকাল সকাল বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন বেলা গড়িয়ে। কোন দিন বা বিকালে বেরুতেন—হয়ত ফিরতেন, হয়ত ফিরতেন না। অন্তত কখন ফিরতেন আমি টের পেতুম না, কেন না ঘুমিয়ে পড়তুম। সকালে উঠে অনেক দিন দেখতুম ও-পাশের খাটে মাথা অবধি মুড়ি দেওয়া একটা মানুষের দেহের আভাস, থেকে থেকে নাক ডাকছে। এমনও দেখেছি, দিনের পর দিন সলিল বাবু ঘর থেকে আদৌ বের হলেন না। মাঝে মাঝে চাদরের বাইরে মুখ বার করতেন, শুধু চা-টোস্ট খেতে। দেখতে পেতুম একগাল দাড়ি, ফোলা-ফোলা চোখ, হলদের ছোপ-লাগা দাঁত। তার পর এক দিন দাড়ি কামিয়ে স্নো ঘষে, ধবধবে জামাকাপড়ে ফিটফাট হয়ে বের হলেন। হলেন ত হলেন, তিন চার দিন তাঁর টিকি দেখা গেল না।

শুনতুম বিজনেস আছে। সেটা যে ফলাও কিছু নয় বুঝতে অসুবিধে হত না, কেন না মেসের পাওনা বাকী রেখে ম্যানেজারের সঙ্গে কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করতেন, সিকিটা আধুলিটা ধার নিয়ে ভুলে যেতেন, মিল বন্ধ হল ত টানা উপোস দিলেন। ওজর দিতেন শরীর খারাপ।

প্রথম দিকে এ সব বুঝতুম না। সকাল সকাল নাকে-মুখে দু'টি দিয়ে কাজে যাচ্ছি, সলিল বাবু তখনও বিছানায় হাই তুলছেন। বলতুম, বেশ আছেন মশাই, হিংসে হয়। পরের গোলামী করবার জন্যে ছোটাছুটি নেই। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসতেন সলিল বাবু। যা বলেছেন। এই একটা মহা সুখ। কারও পরোয়া নেই। বলেই অস্বাভাবিক জোরে হেসে উঠতেন, সেই জোরটুকুকে খাঁটি মনে হত না।

ফাঁকিটা ধরে ফেলতে আমার অবশ্য বেশি দেরি হয়নি। বোধ হয় কোন একটা ছুটির দিন হবে, শুনলুম সলিল বাবু আজ খাবেন না, জ্বর হয়েছে। আগের দিন রাত্রে ম্যানেজারের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটির খবর জানতুম। আজ সকালেই ভদ্রলোককে চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতে দেখে কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলুম। দেখি কত জ্বর।

কী হিংস্রভাবে সলিল বাবু আমার হাতটা ঠেলে দিলেন, আজও মনে আছে! বোধ হয় আঙুলে ওঁর নখের কয়েকটা আঁচড় বসে গিয়েছিল। প্রথমে অপ্রতিভ, পরে বিরক্ত হয়ে বললুম, জ্বর হয়েছে তবে ডাক্তার দেখান না কেন? ওষুধ খান।

চাদরের নীচে মাথা টেনে নিয়ে সলিল বাবু বললেন, এ জ্বরে ওষুধ লাগে না।

বিকালে অফিস থেকে ফিরে আমাদের ঘরেই কিছু চা-ডিম-খাবার ইত্যাদি আনিয়ে নিলুম। মিট-মিট-করে চেয়ে সলিল বাবু বললেন, কী ব্যাপার, মহাভোজ যে?

—খুব খিদে পেয়েছে। আসুন না, আপনিও আসুন।

সলিল বাবু তাড়াতাড়ি চাদরের ভিতর মুখ টেনে নিলেন। ভয়ের ভাব দেখালেন, আসলে সেটা কিন্তু সঙ্কোচ। আমার জ্বর হয়েছে বলিনি ?

—এ জ্বরে চা-জলখাবার খেলে কিছু হয় না। আসুন।

সলিল বাবু এলেন কিন্তু। খেতে বসে তাঁর আর বাধো-বাধো ভাব ছিল না, চায়ের বাটি এক চুমুকে শেষ করলেন, ডিমটা গিললেন এক গ্রাসে। দাঁতে কড়া করে সেঁকা টোস্ট ভাঙার মচমচ শব্দ শুনলুম। অস্নাত, অক্ষৌরীকৃত রুক্ষ মুখটা যেন একটা ক্ষুধিত জন্তুর। হাতের তেলোতে মুখ মুছে সলিল বাবু কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে চোখে কৃতজ্ঞতা ছিল না, প্রীতি না, কিছুটা কৌতূহল হয়ত ছিল, বেশিটাই অবিশ্বাস। আয়নার সামনে শিথিলবাস প্রসাধনরত মেয়েরা হঠাৎ কারও পায়ের শব্দ শুনে যে চোখে পিছন ফিরে তাকায়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আলো জ্বলে নি। ধীরে ধীরে কর্কশ রেখা ক'টি মিলিয়ে গিয়ে সলিল বাবুর মুখে কোমলতা ফিরে এল। ঈষৎ ভাঙ্গা কিন্তু চাপা গলায় ওঁকে বলতে শুনলুম, আপনি খুব চালাক লোক মশাই! আপনার নিশ্চয় খিদে পায়নি, আমার জন্যেই আজ এসব আনিয়েছিলেন।

প্রতিবাদ করলুম না। কী মোহ আছে মেসের এই কানা ঘরে হেমন্তের ধোঁয়া-বোবা সন্ধ্যার, অপরিচিত মানুষও কাছে আসে। অনেক পরে আস্তে আস্তে বললুম, বিজনেসে আপনার বোধ হয় সুবিধে হচ্ছে না সলিল বাবু, আপনি বরং একটা চাকরি নিন।

এর জবাবে সলিল বাবু আমার হাত জড়িয়ে ধরবেন ভাবিনি। মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, আছে, আছে আপনার খোঁজে ? পাইয়ে দেবেন একটা চাকরি ? আমি নিজে ত কোন চেষ্টা বাকী রাখিনি।

সেদিন সলিল বাবু ওঁর বুকের উপরটার মত ভিতরটাও নিরাবরণ

করে দিয়েছিলেন। আবরু, লুকোচুরি ছিল না। চাকরি ত সলিল বাবু একটা করতেন আগে, জগন্নাথ ঘাটের কোন স্টিমার কোম্পানীতে। পার্টিশনের পরে পূর্ববঙ্গের ইউনিট আলাদা হল, এদিককার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়ল। সলিল বাবু একদিন অফিসে গিয়ে শুনলেন তাঁর এবং আরও কয়েক জনের চেয়ার বাড়তি হয়েছে। এ দিকে বিধবা বোন চলে এসেছে ছোট একটি ছেলের হাত ধরে। ছোট ভাই কলকাতায় সলিল বাবুর কাছে থেকে কাজকর্মের চেষ্টা দেখত, সে পড়েছে শক্ত অসুখে। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, পরে নিশ্চিত জানা গেল, টি, বি। বোনকে কোথায় রাখেন, ভাইকে হাসপাতালে দিতে হবে তার তদ্বির করেন, না চাকরির। শেষ পর্যন্ত দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় বোনের একটা জায়গা যদি বা হল, তারা আবার ছেলেটিকে রাখতে চায় না। আসলে ওদের ইচ্ছে বিমলাকে যদি দু'মুঠো খেতে দিতেই হয়, তবে দস্তুরমত খাটিয়ে নিতে হবে। সে রাঁধবে, বাসন না মাজুক, দরকার হলে ছেলে ধরবে। নিজের ছেলে থাকলে পরের ছেলের দিকে নজর দেবে কখন! অনেক বলে কয়ে সলিল বাবু ওদের তাতেও রাজি করালেন। এমন কি ওই আত্মীয়দেরই সুপারিশে ভাইয়ের জন্যে হাসপাতালে একটা সীটেরও ব্যবস্থা হল। কিন্তু তার খরচ জোগাতে তাঁর নিজের মুখে এখনও রক্ত উঠছে। টুকটাক কাজ যা করেন তাতে আপনার পেট চালানো দায়, বিজনেসটা ভুয়ো।

কত ভুয়ো সেটা সীতাকে দেখার আগে টের পাইনি।

সলিল বাবু কিন্তু পরদিন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছিলেন। সকালে উঠেই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, কেমন আছেন সলিল বাবু? তিনি জবাব দেননি। পাশ ফিরে দেয়ালের দিকে মুখ রেখে শুয়েছিলেন। আরও দু'চারটে কথা জিজ্ঞাসা করেও তার সাড়া পাইনি! অবাক হয়েছিলুম, একটু অপমানও বোধ করে থাকব। পরে নিজেই ভেবে ভেবে ওঁর বিসদৃশ আচরণের একটা

কারণ খুঁজে পেয়েছিলুম। কাল সন্ধ্যার অন্ধকারে যার কাছে কিছু গোপন রাখেন নি, আজ সকালের আলোয় তার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না সলিল বাবু। এই উটপাখী-রীতি ভাল করেই চিনি। নিজেকে ক্রমাগত ধিক্কার দিচ্ছেন সব বলে দিয়েছেন বলে, সব জেনেছি বলে আমাকে। রোষ ঘৃণার রূপ নিয়েছে। আমাকে সলিল বাবু সহজে ক্ষমা করবেন না।

এর বোধ হয় দিন দুই পরে সীতা এসেছিল। চিলে-কুঠির দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, সলিলদা'—সলিল বাবু নেই ?

তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। আছেন। বোধ হয় নীচে গেছেন। সলিল বাবুর সীটটা দেখিয়ে বললুম, বসুন।

সীতা—পরে জেনেছিলুম বলেই প্রথম থেকে নাম দিয়ে মেয়েটির উল্লেখ করতে পারছি। একটু দ্বিধা করল, তার পর বসল। শালীনতা বজায় রেখে যতটা সম্ভব ওকে ততটা দেখে নিলুম। রঙ ফরসা, নাক কিছু চাপা, ঠোঁট ঈষৎ পুরু হলেও মুখশ্রী মোটামুটি। রোগা, তবে স্বাস্থ্যহীন নয়। কপালে দু-একটি ব্রণ শুকিয়ে কালো হয়ে এসেছে, পাউডারের ছোপ কণ্ঠার ঘামাচি ক'টিকে ঢাকতে পারেনি। পরনে খেলো রঙিন একটা শাড়ি, একটু ক্রীমও বুঝি ঘষে এসেছে, তা আসুক কিন্তু এসেন্স মাখতে গেল কেন।

সলিল বাবু ফিরে এসে থমকে দাঁড়ালেন। কতক্ষণ এসেছ সীতা ?

—এই মিনিট কয়েক। ইনি বললেন, তুমি নীচে গেছ, এখুনি আসবে।

ইনি ? এতক্ষণে আমার দিকে সলিল বাবুর নজর পড়ল, মুখ-পেশী কঠিন হল। শুকনো হেসে বললেন, ও, আপনি ঘরেই আছেন বুঝি ? সেই সন্ধ্যার পর এই প্রথম সোজাসুজি আমার সঙ্গে কথা বললেন। নিজের ঘরে নিজে আছি এটা অপরাধ কি

না ঠিক বুঝতে না পেরে বিব্রত হয়ে উঠলুম, বোকার মত হাসতেও হল। তার পর কয়েক সেকেণ্ড কারও মুখে কথা নেই। সলিল বাবু গায়ে পাঞ্জাবি চড়ালেন, দেখাদেখি আমাকেও চড়াতে হল, তিনি হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিলেন, আমিও করলুম। আড়-চোখে চেয়ে দেখলুম সীতা মাথা নীচু করে পায়ের নখে নিজের মন দেখছে।

এর পরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই হয়। চৌকাঠের বাইরে পা দিতেই রূঢ় গলা কানে এল, আমার চিরকুট তবে পেয়েছিলে? কিন্তু তোমাকে এখানে আসতে ত বলিনি।

একটি সঙ্কুচিত গলা শোনা গেল, কি করি, সেই মোড়টায় কোথা দিয়ে যেতে হয় কিছুতেই মনে পড়ল না যে। তা ছাড়া মোড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সবাই কেমন তাকাতে থাকে, আমার ভয়-ভয় করে।

জবাবে সেই নীরস গলা: আর তুমি বুঝি ভেবেছিলে মেসে এলে কেউ তাকায় না?

কটাক্ষটা হয়ত আমাকে। তাড়াতাড়ি সরে পড়লুম।

একটু পরে ওঁরাও বেরিয়েছিলেন। নীচে নেমে সলিল বাবু একটা রিক্‌শা ডাকলেন, ছাদের কোণ থেকে দেখতে পেলুম।

অন্যান্য দিন ঘুমিয়ে পড়তুম, সেদিন কিন্তু জেগে ছিলুম। সলিল বাবু ফিরলেন, তখন এগারোটা হবে। অন্ধকারে জামা-কাপড় বদলালেন, খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, ছুঁলেন না, শুয়ে পড়তে যাবেন, হঠাৎ কী দুর্বুদ্ধি হল, ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলুম, বেড়ানো হয়ে গেল সলিল বাবু?

সলিল বাবু চমকে উঠবেন জানতুম। অন্ধকারেও ওঁর ফ্যাকাশে মুখটা যেন দেখতে পেলুম।—আপনি এখনও ঘুমোন নি?

—না।

সীতা দেবীকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসেছেন?

সলিল বাবু কতটা চটে যান পরখ করার দুঃসাহস মাথায়

চেপেছিল। আশ্চর্য, ভদ্রলোক এতটুকু রাগ করলেন না। শিস দিয়ে হিন্দী গানের একটা কলি গাইলেন। মেজাজটা যেন ফুর্তির ভেলায় ভাসছে। কাছে এসে আমার বিছানায় বসলেন। আবদার আর অভিমান-মেশানো গলায় বললেন, সীতা কে জিজ্ঞাসা করলেন না ত ?

বললুম, ধরে নিয়েছি আপনার বান্ধবী। তাই অশোভন কৌতূহল দেখাই নি।

পা দোলাতে দোলাতে সলিল বাবু কী যেন ভাবলেন। বান্ধবী উঁহু, বান্ধবী নয়। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।

নাকে চড়া চড়া, পচা পচা গন্ধ এসে না লাগলেও বুঝতে পারলুম সলিল বাবু আজ কথা বলবেন। সন্ধ্যাবেলা ঝিরঝিরে বৃষ্টির পর গলিটা কাদা হয়ে ঘুমোচ্ছে, কনকনে হাওয়া কখন থেকে পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে চলেছে, তবু তাঁর সাড়া নেই। ঘরের আলো নেবানো, আমরা পরস্পরকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনে। এই স্তব্ধ গম্ভীর পরিবেশে সেই সন্ধ্যার বাচালতা আবার ফিরে পেয়েছেন সলিল বাবু। বললেন, জানেন, আমাদের বিয়ে হবার কথা ছিল।

পাছে সলিল বাবুর মোহ ভাঙে, সেই ভয়ে সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করলুম, হল না কেন ?

হত। চেনাশোনা কি আজকের, সীতা সলিল বাবুর দেশের মেয়ে। কলকাতায় চাকরি করতে আসবার পরেও দু'জনের কত বার দেখা হয়েছে। স্টিমার কোম্পানীতে যখন কাজ করতেন, কত বার নানা ছুতোয় মালের জাহাজেই সলিল বাবু দেশে গেছেন। রীতিমত রোম্যান্টিক ব্যাপার !

তবু বিয়ে হল না ? বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম।

মাথা নেড়ে নেড়ে সলিল বাবু বললেন, তবু হল না। স্টিমার কোম্পানীর চাকরিটাই গেল যে। ম্রিয়মাণ গলা, একটু আগেকার ফুর্তি চুপসে কখন বিষণ্ণ হয়ে গেছে। না কি, বিষণ্ণতাই ফুর্তির

ছদ্মবেশ পরে এসেছিল! করুণ সুরে সলিল বাবু বললেন, চাকরিটাই গেল যে। বেকার কি বিয়ে করে?

কিছু দিন বাদে সীতারাও এখানে এল। ওর বাবা ইস্কুলে কাজ করতেন, তা ছাত্ররাই রইল না ত কাঠের বেঞ্চিগুলোকে কি পড়াবেন? দুর্ভাবনা বড় বড় মেয়েদের নিয়েও।

সলিল বাবু আবার গলা নামিয়ে নিলেন।—আপনাকে বললুম বটে বেকার কি বিয়ে করে, কিন্তু আপনার কাছে লুকোব না, সে ইচ্ছে একেবারে যে বিসর্জন দিয়েছিলুম, তা নয়।

ওরা আসবার মাসখানেক পর খবর পেয়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন। গা-ঘিন-ঘিন গলির ভিতর টালির ঘর। সীতার বাবা দরজা খুলে দিলেন।—ও, তুমি? এস। ভাবলেশহীন কণ্ঠস্বর। দরজা খুলে দিয়েই সরে গেলেন। চাকরি নেই ওঁরাও জানতেন কি না, খারাপ খবর বাতাসের মুখে দৌড়য়। সীতার মা কিন্তু আদর-যত্ন করেছিলেন। সীতার বোনেরাও এসেছিল। মানা, কান্না, আন্না। বেশ বড় হয়ে গেছে, তবু ফ্রক ছাড়েনি, শুধু শেমিজের খরচায় শাড়ি আর শেমিজের দরকার মিটছে। সকলেরই কুতকুতে ভীত চোখ, বুকের উপর আড়াআড়ি করে দু' হাত রাখা। শেষবয়সী মেয়েদের বেশবাসে শরীরের বিলীয়মান রেখা ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস, এদের ঢাকা দেবার।

এত কথা বললেন সীতার মা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তবু আশ্চর্য, বিয়ের প্রসঙ্গ কেউ একবার তুললে না। তুললে সলিল বাবুকে 'না' বলতেই হত, কিন্তু ওরা একবার কথাটা পাড়লে না কেন?

বললুম, সীতাও না?

সীতাও না। দরজা বন্ধ করে দিতে সেই ত সলিল বাবুর পিছে পিছে এসেছিল। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় দু'জনে একটা দু'টো কথাও বলেছিলেন, কিন্তু সলিল বাবু যা চাইছিলেন সীতা তার ধার দিয়েও গেল না, হাত বাড়িয়ে সলিল বাবু ওর একটা

আঙুল ধরলেন, বাধা পেলেন না, সাড়াও না, কয়েকটি মড়া পাশার হাড় যেন হাতের মুঠোয় মড়মড় করে উঠল।

চলে আসার আগে সীতা বলেছিল, 'আমাকে একটা কাজ খুঁজে দাও সলিলদা'।

নিজেরই কাজ নেই, সলিল বাবু হেসে বলেছিলেন, কী কাজ চাও তুমি?

—যা হোক কিছু। বাবার চোখে ছানি পড়ে এসেছে, উনি আর চাকরি করতে পারবেন মনে হয় না। পারলেও পাবেন না। একটা মাস ত এখানে কোন মতে চলল। এর পর? ইস্কুলে পড়া বিদ্যে বেশি নয় আমার, বাড়িতে বসে যা শিখেছি তা দিয়ে কিছু জুটবে না?

এর পরে সেই পরিবেশে বিয়ের কথা বেসুরো শোনাত। খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে সলিল বাবু সেদিন চলে এসেছিলেন। দিন কতক গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। সীতা থাকতে দেয়নি। এই মেস অবধি চলে এসেছে। সলিলদা আমার কাজ? সলিলদা, চাকরি? চলে যায়, আবার ফিরে আসে। কাজের খোঁজ আছে, চাকরির? রোজ এক ঘ্যানঘেনে প্রশ্ন। নিজের সমস্যায় সলিল বাবু পাগল, বিরক্ত হয়ে একদিন বললেন, চাকরি, মানে কিছু টাকা রোজগার করতে চাও, এই ত। একটা খোঁজ দিতে পারি, রাজী? তাতে আমারও হয়ত কিছু থাকবে।

সীতা সাগ্রহে কাছে এসেছিল, ওর নিশ্বাসের তাপ বহুদিন পরে লাগছিল গায়। সলিল বাবুর ধীরে উচ্চারিত কথাগুলো শুনে আবার আগের চেয়েও দূরে সরে গিয়েছিল। মুখ কালো, স্ফুরিত ঠোঁট, তীব্র গলায় শুধু বলেছিল, ছোটলোক! আর এক মুহূর্ত বসেনি। দিন পনেরো আর দেখা নেই।

দীর্ঘ একটা যতি দিলেন সলিল বাবু। হয়ত দম নিলেন। হয়ত সঙ্কোচ জয় করলেন। তার পর এক চুমুকে পেয়ালা খালি করার মত দ্রুত গলায় বাকীটুকুও বললেন।

রাগ দেখিয়ে যে চলে গিয়েছিল সেই মেয়ে নিজে থেকে এক দিন এল। ফণা নেই, ঝাঁঝ নেই। বাবার চোখের ছানি এ কয় দিনে আরও পুরু হয়েছে, মা কবে যেন কলতলায় পিছলে পড়ে কোমর ভেঙেছেন, মানা পাড়ার কোন ছেলের সঙ্গে এক দিন কাউকে না বলে ম্যাটিনিতে সিনেমা দেখে এসেছে। সেদিনের মতই সীতা গা ঘেঁষে বসল, কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, তোমার এখন আর রাগ নেই ত সলিলদা ?

রাগ কেন, কার উপর ? রাগ ত তুমি করেছিলে।

না, এমনি বললাম। আচ্ছা সলিলদা, তুমি সেদিন একটা প্ল্যান দিয়েছিলে…ঠাট্টা করনি, না ?

সলিল বাবু বললেন, না।

সীতা মাটির দিকে চেয়ে বলল, সেটা এখনো কি—কঠিন মর্মভেদী চোখে ওর দিকে চেয়ে সলিল বাবু বললেন, এখনো। তুমি রাজী ?

নতনেত্র সীতার মৌনই সম্মতি হল।

তবু প্রথম দিকে নানা অসুবিধে ছিল। রাস্তায় নেমে সীতা বলত, আমার গা ঠকঠক করছে সলিলদা, ভারি ভয় করছে, তুমি আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে চল।

ওর পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন সলিল বাবু, সাহস দিয়েছেন। ভয় কী। মোটরে একটু হাওয়া খেয়ে আসবে বই ত নয়! বড় জোর দেড় ঘণ্টা। ওরা আবার এই কাফেতেই পৌঁছে দিয়ে যাবে।

অবাক ব্যাপার এই, এত সাহস দিয়ে সীতাকে বিদায় করতেন; অথচ ওরা চলে যেতেই সলিল বাবুর নিজেরই কেমন গা ছমছম করত। সরু সুড়ঙ্গের মত সেই কাফেতে কত লোক আসে-যায়। কারা আসে, কেন আসে, কী চায়, এখন রাত কত, ওদিকে খুপরিতে কে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, তার সঙ্গী তাকে ধমক দিতে গিয়ে নিজে অমন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল কেন, মশমশ খুটখুট জুতোর চলা, চীনেমাটি আর কাচের বাসনের টুং টাং, সব যেন

ছায়া-ছায়া একাকার, বোবা বোবা কানা কানা দম বন্ধ ভয়। গলিত আগুনে গলা জ্বালিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সেই ভয়ের হাত থেকে রেহাই নেই।

আবার ঝুপ-ঝুপ বৃষ্টি নেমেছে। চিলেকোঠার জানালার পাল্লা হঠাৎ খুলে গিয়ে ফের বন্ধ হয়ে গেল। সলিল বাবু হেসে বললেন, সীতার এখন কিন্তু একটুও ভয় নেই।

চুপ করে থেকে বললুম, ওকে আপনি এখনও বিয়ে করে ফেলুন সলিল বাবু! এ কী সর্বনাশ করছেন?

শ্বাস পতনের দীর্ঘ একটা শব্দ শুনলুম।—আর হয় না। সীতার মা-বোনদের উপায় কী হবে? আর, বিয়ে যে করব, বাসর হবে কি সদর রাস্তায়? এখন যে দু'মুঠো জুটছে, তাও ত বন্ধ হবে। যে ডালে বসে আছে সে ডাল কি কেউ কাটে? আর হয় না। সলিল বাবু আবার বললেন, কোন দিন বিয়ে হবে না জেনেই না ওর সঙ্গে এই বোঝাবুঝিতে নেমেছি। সীতাও রাজী হবে না।

সেই বোঝাবুঝিতেও কত ফাঁকি সেদিন বুঝিনি। পরদিন আড়াল থেকে ওদের কথা শুনতে না পেলে বোঝা হতও না।

আমার উপর বাজার করার ভার পড়েছিল। কেনা-কাটা সারা হতে দেখি অফিসের বেলা হয়ে গেছে। তেল মেখে নেব বলে তাড়াতাড়ি উপরে চলে এলাম। কিন্তু ঘরে ঢোকা হল না। স্পষ্ট মেয়েলী গলা কানে এল। তোমার পায়ে পড়ি সলিলদা, আজ অন্তত কুড়িটা টাকা দাও।

রুক্ষ, বিরক্ত জবাব: তোমাকে বলেছি না, আজ ভাঙানো নেই, কাল দেব?

সরে যাওয়া উচিত ছিল, স্বীকার করছি, যাইনি। ওখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলুম। সীতাকে বলতে শুনলুম, কিন্তু আমার যে

এখনই দরকার সলিলদা। চাল কেনা হবে, তবে উনুন জ্বলবে। খাব কী সেটা ভাবছ না ?

সলিল বাবু নির্মম গলায় বললেন,—কাল ত অনেক খেয়েছ, তাতেও পেট ভরেনি ?

—সে ত চপ-কাটলেট। তাতে ক'দিনের খিদে মেটে সলিলদা ? আর আমার মিটলেই কি বাকী সকলের মেটে ?

বাজে তর্ক করো না। আসল কথা তোমাকে ত বলেছি, নোট ভাঙানো হয়নি। হলে তোমার পাওনা কড়াক্রান্তি হিসেব করে মিটিয়ে দেব। আমাকে এটুকু বিশ্বাস কর না ?

—করি, খুব করি। সীতার গলা ধরে এল,—কিন্তু আমি বাড়ি ফিরে ওদের কী বলব বলে দাও। চাল ছাড়া মানা-কান্নার ফ্রক ছিঁড়ে গেছে, ছিট কিনতে হবে, মার ওষুধ—

বোমা ফাটানোর মত গলার আওয়াজ করে সলিল বাবুকে বলতে শুনলুম, চুপ কর।

সত্যিই কয়েক সেকেণ্ডের জন্য সীতা যেন ভয় পেয়ে চুপ করে গেল। একটু পরে দাঁতে-দাঁত-চাপা স্বর শোনা গেল,—শঠ জোচ্চোর ! তোমার কীর্তি আমি জানি না ভেবেছ ? আগরওয়ালার কাছ থেকে তুমি এর মধ্যে ত্রিশ টাকা নিয়েছ, আমাকে বলনি।

আশ্চর্য, জবাবে ধমক নয়, সলিল বাবুর বিরস গলার হাসি শুনতে পেলুম।—ঠিক। কিন্তু জোচ্চুরি বা লুকোচুরি যাই বল, সে কি আমি একা করেছি ? সীতা তুমি করনি ? খাস্তগীরের কাছ থেকে হাত পেতে ইয়ারিং নিয়েছিলে, সে কথা আমাকে জানিয়েছ ? টাকার দরকার যদি এতই বেশি ছিল, তবে সেটাকেও বাঁধা রাখতে পারতে ?

সীতার চমকলাগা গলায় যেন ওর বিবর্ণ মুখ দেখতে পেলুম।—সে ইয়ারিং তো গিল্টির। কে বাঁধা রাখবে বল ?

মনে হল সলিল বাবু যেন সীতার কাছে সরে গেলেন। কাঁধেও হাত রাখলেন কি না বলতে পারি না! অবিচল গলায়

বললেন, তোমার ইয়ারিং গিল্টির সীতা ? আগরওয়ালা আমাকে যে নোটটা দিয়েছে, সেটাও তেমনি জাল। জাল বলেই টাকাটা ভাঙ্গাতে পারিনি। ওটা আগরওয়ালাকে ফেরত দিয়ে বদলে নিয়ে আসব।

শাড়ির খসখস, সীতা বুঝি ছিটকে সরে গেল। জাল ? কক্ষণো না। মিথ্যুক !

—বেশ, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পার। সলিল বাবুর উদাসীন, নিষ্কম্প গলা।—ওইত আমার জামার বুকপকেটে আছে, নামিয়ে নাও।

—চাই না। আমি নোটের আসল নকল চিনি না। দীর্ঘ স্তব্ধতার পর সীতার ক্লান্ত গলা শুনতে পেলাম, এখন আসি সলিলদা। টাকা তুমি যখন দেবেই না।

—দেব না ত বলিনি। নোটটা বদলানো হলে তোমাকে শেষ পাইটি বুঝিয়ে দিয়ে আসব, বুঝেছ ?

দরজার মুখে ছায়া পড়ল। তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালুম। খোঁপা এলানো, শাড়িরও ভাঁজ নেই, সীতাকে টলতে টলতে বেরিয়ে যেতে দেখলুম।

কয়েক দিন পরেই লখনউ চলে যেতে হয়। জানি না সীতা আর কোন দিন মেসে ফিরে এসেছিল কি না। সেদিন কে সত্যি কথা বলেছিল তাও জেনে নেওয়া হয়নি। হয়ত দু'জনেই, হয়ত কেউ না। দুলটা খাঁটি, গিল্টি দুই-ই হতে পারে, নোটটা আসল বা জাল। গল্পের শেষটাও অজানা রয়ে গেছে, তবে দূর থেকে আশা করছি ওদের বিচিত্র যৌথ চুক্তির পরমায়ু বেশী দীর্ঘ হয়নি ; যেখানে দুই অংশীদারের মধ্যে এত সন্দেহ আর অবিশ্বাস, সেখানে হয় না।

পরমায়ু

হাওড়া ইস্টিশনে গাড়ি দাঁড়াতেই প্রথমে কুলি পরে হোটেলের দালালেরা ছেঁকে ধরেছিল, ঠিক দশ বছর আগেও যেমন ধরত, তেমনই পায়ে-পায়ে-ঠোক্কর, ভিড়, কানেতালা-লাগা শোরগোল। একটু বেশী বই কম নয়। তবু গেটে টিকিটটি সঁপে বাইরে পা দিয়েই সুরপতি নিজেকে বড় একা বোধ করেছিলেন। ম্যামথকঙ্কাল ব্রীজটার নীচে ভাগীরথী যথাপূর্ব পুণ্যদায়িনী, পণ্য বাহিনী ; উপরের ধোঁয়াঘোলাটে আকাশটুকুও চিনতে পারছেন ঠিক। তবু সুরপতি মৃদু গলায় নিজেকে বললেন, "কিছুই আসলে তখনকার মত নেই।" মোড়ে মোড়ে এমন লালচোখ আলোর ধমক কি তখন ছিল, না দূরে দূরে এত আকাশলেহী বাড়ি। সেকালের হিলহিলে পিছল-কেঁচো গলিগুলিও কেমন উদারহৃদয় হয়ে গেছে দেখ।

প্যাঁকপ্যাঁক ট্যাক্সিকে কেবলই ডাইনে বাঁয়ে ঘোরার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মনে মনে ভয় পেয়েছেন, সেই পীতাম্বর সাহা লেনটিকে বোধহয় খুঁজে পাবেন না। ভারি ভারি উৎসাহী শহর-সংস্কারক রোলারের তলায় সে হয়ত কবে গুঁড়িয়ে গেছে। ঝুঁকে পড়ে সুরপতি এদিক ওদিক দেখেছেন, আর সন্দিগ্ধ, হয়রান ট্যাক্সি-ওয়ালাকে ভরসা দিয়েছেন, "আর একটু আরও একটু।"

অবাক ব্যাপার, কী এক সুকৃতির জোরে পীতাম্বর সাহা লেনটি বেঁচে গেছে। আর দশ বছর আগে জীর্ণবাসের মত যাকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, সেই মেস-বাড়িটিও। ট্যাক্সিকে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন আগে, সামান্যই সামান, নামিয়ে নিতে অসুবিধে হল না। তার পর কড়া নাড়লেন।

ছাইমাখা হাতের পিঠ দিয়ে যে ঝি দরজা খুলে দিল, তাকে সুরপতি চেনেন না, অন্তত তাঁর আমলে দেখেননি। জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুকূলবাবুর মেস ত? কম কথার মানুষ ঝি, আঙুল

দিয়ে অফিসঘর দেখিয়ে দিল। একটা চাকর সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছিল, সেও নতুন। অফিসঘরের বাঁধানো কালীর পটটা ধুলো আর ঝুলে ভরে গেছে ; কাচও ভাঙা, তবু চেনা যায়। কমলেকামিনী ক্যালেণ্ডারটা অবশ্য তখন ছিল না। টেবিলের উপরে দু'পা তুলে দিয়ে যিনি নাকে সর্গম তুলছিলেন, তিনি সুর-পতিবাবুর পায়ের সাড়ায় চোখ মেলে তাকালেন। পা দু'টি নামিয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি। "কী চান ?"

নাকে যার মেঘডম্বর, তার গলার আওয়াজ এত মিহি কী করে হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে সুরপতিবাবু তখনই যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি, তার কারণ তখনও এখানে আশ্রয় পাবেন কিনা, তার নিশ্চয়তা ছিল না সুতরাং ক্ষীণতর কণ্ঠে বলেছেন, "অনুকূলবাবুর মেস ? এখানে সীট পাওয়া যাবে ? ক'দিন থাকতে চাই।" শ্রোতার মুখের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হল না দেখে তাড়াতাড়ি জুড়ে দিয়েছেন, "অনুকূলবাবুকে আমি চিনি। এখানে আমি অনেক দিন আগে থেকে গেছি। আমার নাম সুরপতি চৌধুরী।"

ভেবেছিলেন, নামটা শুনে লোকটা হয়ত চকিত চোখে তাকাবে, শ্রদ্ধায় সমীহে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলবে, বসুন। আশানুরূপ ভাববৈলক্ষণ্য দেখতে পেলেন না। লোকটি নিরুত্তরে শুধু একটা খাতা ঠেলে দিয়ে বলল, "সই করুন। পেশা, বর্তমান ঠিকানা, এ-সবও লিখবেন। রুলটানা ঘর আছে, দেখে নিন।"

পেশার ঘরে লিখতে পারতেন 'ব্যবসা,' তবু কী ভেবে সুরপতি লিখলেন 'লেখক'। লোকটার মুখে তবু বিস্ময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কতকটা ওকে শুনিয়ে, কতকটা নিজের মনে মনে বললেন, "সবই কেমন বদলে গেছে, না ? পুরনো বোর্ডার কি একজনও নেই ?" কথাটা নিজের কানেই কেমন বোকা-বোকা শোনাল ; সেটা ঢাকা দিতেই সুরপতি যেন আরও একটু বোকার মত হাসলেন, "কালীর পটটা কিন্তু ঠিক আছে। অনুকূলবাবু এখনও দু' বেলা জপ করেন ?"

সে-কথার জবাব না দিয়ে লোকটা গম্ভীর গলায় বললে, "পাঁচ টাকা অ্যাডভান্স্।" ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডেকে হুকুম দিলে, "মাল দোতলায় ছ' নম্বর ঘরে তুলে দে।"

অনুকূলবাবু চিনেছেন ঠিক। অফিস-ফেরত খাতায় নাম দেখে সোজা উঠে এসেছেন উপরে। আগেকার তুলনায় কিছু শীর্ণ, একটু বা ময়লা। হাসলেন, দেখা গেল দু'টি দাঁতও খুইয়েছেন। বললেন, "তাই ত বলি, কে। ভাগনে বললে, পুরনো বোর্ডার। তা ও ত এই সবে বছর দুই হল দেশ থেকে এসেছে, আপনাদের দেখেনি। শুধু ওই 'লেখক' কথাটি লিখেই যা ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলেন মশাই।"

"কেন, আমি কি লেখক নই?" ভয়ে ভয়ে, কতকটা আত্ম-পরিচয় দেবার কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে, সুরপতি বললেন, "আপনার কিছু মনে থাকে না অনুকূলবাবু। এই মেসে বসেই তিনটে বই—"

"মনে থাকবে না কেন, আছে। যাবার আগেও মেসের এই ঘরটিতেই ছিলেন। রেলে চাকরি পেলেন, তিন মাসের মাথায় বদলি। আমাদের সবাইকে জোর ফীস্ট দিয়েছিলেন, বলছেন মনে নেই? এ-শর্মার সব মনে থাকে সুরপতিবাবু। কত বোর্ডার এই ত্রিশ বছরে এল গেল, কাউকে ভুলিনি। এখনও সবাইকে ডেকে বলি, তোরা এক টুকরো মাছের ভাগ কম হলে চেঁচিয়ে মাথা ফাটাস, জানা আছে কে কোন্ লাটের বেটা। এই মেসেই আগে অনেক বড় বড় চাকুরে থেকে গেছে, এখানকার ঝোলভাত খেয়ে অনেকে অফিসার হয়েছে, তারা কোনদিন টুঁ শব্দটি করেনি। অনুকূল শর্ম্মার মেসের ভাতের অনেক পয়।" অনুকূলবাবু সহসা উঁচু গ্রামে একটি হাসি ধরলেন, তার তরঙ্গ দেয়ালে দেয়ালে ঠোক্কর খেল। দু'পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন সুরপতি, হাসির গমকে এই কোনমতে মেরামতি খাড়া বাড়িটির চুনবালি না খসে পড়ে। সে-হাসি সংবরণও করলেন অনুকূল নিজেই। উচ্চতম শিখর থেকে খসে কণ্ঠস্বর একেবারে

গৃহীহিত হল : "এখনও সেই কাজই করছেন ? নিশ্চয়ই এতদিনে গেজেটেড হয়েছেন ?"

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলেন সুরপতি, প্রসঙ্গটা চাপা দিতে তাড়াতাড়ি বললেন, "কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখন ব্যবসা করছি অনুকূলবাবু। রেলেরই ঠিকেদারি।"

ভুরু কপালে উঠে গিয়ে অনুকূলবাবুর চোখ দু'টি আপনা থেকে যেন গোল হয়ে গেল। "ওরে বাবা, তবে ত আপনি এখন আমাদের নাগালের বাইরে। নইলে বলতুম আমার ভাগনেটাকে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে। বলছেন সে-ক্ষমতা আপনার নেই ? জানি সুরপতি-বাবু, চিরকালই আপনি এমনি লাজুক, নিজেকে কিছুতেই বড় বলবেন না। এত ওপরে উঠেছেন, আপনার হ্যাট-কোট-বুট দেখেই বুঝতে পারছি, তবু তেমনি রয়ে গেছেন। দেখেছেন আপনার কথা কিছুই ভুলিনি, স্বভাবটুকুও মনে করে রেখেছি ?"

"বিশ্রাম করুন" বলে অনুকূলবাবু একটু পরে উঠে গেছেন, তবু সুরপতি পোশাক না ছেড়ে অনেকক্ষণ খাটে পা ঝুলিয়ে তেমনি বসে থেকেছেন। দেয়ালে পানের পিকের দাগ, বিলিতী মাটি চটে-যাওয়া মেঝে, দরজার কোণে অধ্যবসায়ী মাকড়শার সূক্ষ্ম কারুকর্ম—সব আচ্ছন্ন ক্লান্ত চোখের সামনে ধীরে ধীরে একটি একাকার অবয়ব হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা বুঁজে আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছেন সুরপতি। কিছুই ভোলেননি, এ-কথা অনুকূলবাবু বারবার তারস্বরে ঘোষণা করে গেছেন, তবু একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনের নীচতলা থেকে এই ভয়টা উঠে এসেছে, সে দিনের অনেক কথাই বুঝি অনুকূলবাবুর মনে নেই। এই ঘরে বসে একদিন তার লেখা নাটকের পুরো তিনটি অঙ্ক পড়ে শুনিয়েছিলেন, উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত স্বরে, সে-সব না হয় ভুলেই গেছেন, কিন্তু তাঁর একটি উপন্যাস যে অনুকূল বাবুকে উৎসর্গ করেছিলেন তাও কি মনে নেই ?

কতক্ষণ চুপচাপ চোখ বুঁজে ছিলেন হুঁশ নেই, হঠাৎ টুপ করে একটা আওয়াজ হতেই সুরপতি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। উপরের

কড়িকাঠ অর্ধেকটা উইয়ে খেয়ে গেছে, একটা তড়বড়ে টিকটিকি সেটা টপকাতে গিয়ে খসে গিয়ে থাকবে। পড়েই তরতর দৌড়, কিন্তু লেজটা রেখে গেছে এখানেই, সুরপতির বালিশটার ঠিক পাশেই। তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে তিনি টিকটিকিটাকে চেপে ধরেছিলেন কিনা, ঠিক খেয়াল করতে পারলেন না সুরপতি কিন্তু ধরে থাকতেও পারেন এই সন্দেহে গায়ে কেমন কাঁটা দিল, যে-হাতটা বালিশে রেখেছিলেন সেটা যেন বশে নেই। হেঁট হয়ে সুরপতি মোজা পরতে শুরু করলেন, হাতড়ে খাটের নীচে থেকে জুতো জোড়াকেও টেনে আনলেন ঠিক। তাই ত, বড় দেরি হয়ে গেছে। এখুনি অফিসারের বাড়ি দৌড়োতে হবে পাঁচ নম্বর স্কীমের ঠিকেটার জন্যে, যে-তদ্বিরে এতদূর এসেছেন। ঘড়িতে সময় দেখলেন, সাড়ে ছ-টা। এরই মধ্যে এখানে দিন ফুরিয়ে যায়? এই ত একটু আগে খাটের পায়ার কাছে সে বসেছিল, শেষবেলার নরম এক টুকরো রোদ, পা গুটিয়ে ছোট মেয়েটির মত। তাকে পাহারা রেখে সুরপতি চোখ বুজেছিলেন। আর যেই চোখ বোঁজা অমনি সঙ্গে সঙ্গে সে পালিয়েছে, একছুটে হয়ত সিঁড়ি টপকে, হয়ত জানালা গলিয়ে। এ-ঘরে শুধু একমুঠো অন্ধকার তার পায়ের ধুলোর মত পড়ে আছে।

খুট করে ফের শব্দ হল: চাকর চা এনেছে, আলো জ্বেলেছে।

গায়ে কোট চড়াতে চড়াতে সুরপতি ঘর্ঘর গলায় তাকে বললেন, "ওখানে রেখে যাও।" দেয়ালের পেরেকে হাত-আয়না ঝুলিয়ে সুরপতি সোজা হয়ে সামনে দাঁড়ালেন। দশ বছর আগে এই ঘরে যে-যুবকটি কেরানীগিরির ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যসাধনা করত, আয়নার ছায়ায় তাকে দেখতে পাবেন এ-দুরাশা ছিল না; যদিও সেই পুরনো পরিচিত পরিবেশ, স্যাঁতসেঁতে দেয়ালে চামচিকে গন্ধ, তবু নিজের-হাতে-কাচা পাঞ্জাবি-পরা সেই উজ্জ্বলচোখ ছেলেটি দেখা দিল না। সুরপতি যাকে দেখলেন, তার সিঁথির দুপাশে চুল বিরল, কানের উপরটা রুপোলী, গলায় ঝকঝকে মসৃণ-ভাঁজ টাই;

চোখ দু'টি ছাড়া বাকী সবটুকুই তার উজ্জ্বল। মামুলি ছবি, জীবনে সফল প্রৌঢ়ের।

হ্যারিসন রোডের মোড়ে বাসটা যদি অতক্ষণ না দাঁড়াত, তবে কী হত বলা যায় না। সুরপতির হয়ত খেয়ালই হত না, একদা-অতি পরিচিত বইয়ের দোকানের সারি পিছনে ফেলে যাচ্ছেন। ফুটপাতে, রেলিঙের ধারে তখনকার মতই ভিড়, কাটা কাপড় আর পুরনো বইয়ের দোকানের সারি। বাস থেকে সেখানে নেমে একবার থমকে দাঁড়িয়েছেন সুরপতি, রকমারি বেসাতির ওপর চোখ বুলিয়েছেন, কিন্তু দাঁড়াননি, তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে গেছেন ওধারে, যেখানে কাচের শো-কেসের আড়ালে নয়নাভিরাম নতুন বইয়ের প্রদর্শনী। সেখানে এক মিনিট দাঁড়ালেন, কাঁচ ঘষে নিলেন চশমার, নামগুলো একবার পড়লেন। বেশির ভাগই নতুন নাম, তবু ওরই মধ্যে দু-একটা সুরপতির চেনা। ভিতরে গেলেন, সেখানেও কাউন্টারে অজস্র বই ছড়ান, কেনাবেচার ভিড়। গলদ-ঘর্ম কয়েকটি লোক ক্যাশমেমো কাটছে, আরও বই বয়ে আনছে। আরো, আরো।

" 'প্রলয়বীণা' কী রকম টানছে দেখেছিস।"

"আর সাতটা দিন যেতে দে, দেখবি এডিশন কাবার।" কাউন্টারের ওপাশে ওরা বলাবলি করছিল, সুরপতি শুনতে পেলেন।

এপাশ থেকেও কয়েকজন ক্রেতা আরেকটা বইয়ের নাম বারবার চেঁচিয়ে বলছিল, "মন-আগুন"।

" 'মন-আগুন', 'মন-আগুন' দু' কপি,"—কাউন্টারের ওদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। বইও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এল। একটি লকলকে শিখা সমগ্র বইটিকে বেষ্টন করে আছে। এক কোণে পরিপাটি হরফে লেখক আর বইয়ের নাম। এমন সুদৃশ্য প্রচ্ছদ সুরপতির চোখে বেশি পড়েনি। লোভ হল হাত বাড়িয়ে বইটি স্পর্শ করেন।

করলেনও। পাতা উলটে গেলেন। আসল বইটা যেখানে শুরু তার আগেকার কয়েকটা পৃষ্ঠাই একরকম সাদা। কোনটাতে বইয়ের নাম লেখা আছে, কোনটাতে লেখকের। একটা জায়গায় প্রথম প্রকাশের তারিখের নীচে স্থরপতি দেখতে পেলেন, বড় বড় হরফে লেখা, দশম মুদ্রণ। দশম !

আর ঠিক তখনই স্থরপতি ছেলেমানুষের মত একটা কাজ করে বসলেন। গলা খাঁকারি দিয়ে একবার ঝেড়ে নিলেন, তারপর স্পষ্ট, একটুও না-কাঁপা স্বরে, জিজ্ঞাসা করলেন, "'জোয়ারের জল' আছে ? 'জোয়ারের জল' দিতে পারেন এক কপি ?"

কাউন্টারের ওপাশে ওরা এ ওর মুখের দিকে তাকাল। কেটে গেল কয়েক সেকেণ্ড। আবার চাইবেন কিনা স্থরপতি ভাবছেন, ওদেরই এক জনকে ঢোক গিলে বলতে শুনলেন, "'জোয়ারের জল', কী বললেন, 'জোয়ারের জল' ?"

কপট বিনয়ে স্থরপতি বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। বইয়ের দোকানে কাজ করছেন অথচ এ-বইয়ের নামও শোনেননি ?"

সে-লোকটি পিছিয়ে গেল কিংবা তাকে পিছনে ফেলে সামনে এগিয়ে এল আরেকজন। "'জোয়ারের জল' ? লেখকের নামটা বলতে পারেন ?"

দোকানে আয়না নেই, স্থতরাং মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল কিনা স্থরপতি দেখতে পেলেন না। সামলে নিয়ে, ধীরে কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন, "লেখকের নাম স্থরপতি চৌধুরী।" অন্য খরিদ্দার দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটি বলল, "না, ও নামে কোন বই ছাপা নেই।" অজ্ঞতার লজ্জা নয়, স্থরপতি তার মুখে অবহেলার হাসি দেখলেন। "পাশের দোকানে খোঁজ করতে পারেন।" উপদেশ দিয়েই ছেলেটি হাঁক দিলে, "'প্রলয়বীণা' দু' কপি, 'মন-আগুন' তিন।"

তারপর সারা বিকেল জুড়ে স্থরপতি সেদিন শুধু দোকানে দোকানে ঘুরেছেন। 'জোয়ারের জল' আছে দিতে পারেন এক

কপি? 'ত্রিপূর্ণির ঘাট?' 'রাতশেষের খেয়া?' নেই? সুরপতি চৌধুরীর কোন বই নেই? সবাই বলেছে, না। এক দোকানে কে একজন বুঝি নামটা চিনতে পেরে বলেছে, "ওসব বই এখন আর ছাপা হয় না মশাই। চাহিদা নেই। আমরাও রাখি না। নতুন কিছু চান ত বলুন, বের করে দিই।"

এক দোকানে শিক্ষিত, অন্তত দেখে সুরপতির তা-ই মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বসে ছিলেন। 'রাতশেষের খেয়া' বইটির নাম শুনে হেসে হাই তুললেন। "ছিল মশাই লাস্ট কপি, শেলফের নীচের তাকে অনেক দিন ধুলোবালি মেখে পড়ে ছিল। মাস ছ'য়েক আগে একজন প্রবীণ অধ্যাপক খোঁজ করে কিনে নিয়ে গেছেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর কোন থীসিস লিখে ডক্টরেট হাতাবার ফিকিরে আছেন কিনা খবর নিয়ে দেখুনগে যান।"

সেখান থেকে সুরপতি গেছেন পিছনের গলিতে। এখানে অনেক প্রকাশক, অনেকেই তাঁর চেনা; একটি দোকানের সাইনবোর্ড দেখেই চিনলেন; তাঁর 'জোয়ারের জল'-এর প্রকাশক ত এরাই। একটি টেবিল ঘিরে কয়েকজন বসে। সকলেরই মোটামুটি কম বয়স, অন্তত রাতের আলোতে তাই মনে হল। কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য মার্জিত করে সুরপতি বললেন, "অপূর্ববাবু আছেন?"

যারা বসে ছিল তাদের সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকাল। একজন বললেন, "অপূর্ববাবু ত রিটায়ার করেছেন, বিজনেস এখন দেখছেন ইনি, তাঁর ছেলে, নিশীথবাবু। এঁর সঙ্গে কথা বলুন।"

আঙুল দিয়ে যাকে দেখান হল, সিগারেট আর চায়ের ধোঁয়ায় তার মুখের আধখানা ঢাকা, তবু অপূর্ববাবুর সঙ্গে তার চেহারার মিল সুরপতি সহজেই খুঁজে পেলেন। তাঁর নিজে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। নমস্কার করে ধপ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে, অনুরোধ না হতেই। ঘুরে ঘুরে ঘেমেছিলেন, ঘাড়ে গলায় একবার রুমাল বুলিয়ে নিলেন। নিশীথ চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসল ওঁর মুখোমুখি। একটা সিগারেট ধরাল নিজে, একটা বাড়িয়ে দিলে ওঁর

দিকে, দেশলাই নেবাতে নেবাতে বলল, "মফস্বলের লাইব্রেরি বুঝি? কত টাকার বই নেবেন?"

আর কথা বাড়ান বা দেরি করা চলে না, সুরপতি মরীয়ার মত গলায় বললেন, "আমি সুরপতি চৌধুরী।"

আশ্চর্য, এই প্রথমবার যেন মনে হল, নামটায় কাজ দিয়েছে। ওদের চোখে চোখে কি কথা হল সুরপতি বুঝলেন না, কিন্তু একজনকে বলতে শুনলেন, "আপনি আগে লিখতেন, না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এখান থেকেই আমার দু'খানা বই বেরিয়েছিল।" বলতে বলতে সুরপতি সীলিঙের দিকে চাইলেন, যেন হিসেব করলেন, "বার আর পনের বছর আগে।" নিশীথের দিকে ঝুঁকে পড়ে সাগ্রহ গলায় বললেন, "সে-সব বই এখন আর কেউ পড়ে না, ছাপাও নেই, না?"

"ক-বে ফুরিয়েছে।" হাল্কা, তাচ্ছিল্যভরা গলায় নিশীথকে বলতে শুনলেন, "সেই বাবার আমলেই। সব বোধ হয় বিক্রি হয়নি। কেন, আপনার অ্যাকাউণ্ট ত বাবাই—"

"হিসেব নিতে আসিনি, বলছিলুম কি, বইগুলো যদি আবার—"

"ছাপতে বলছেন?" অসহায়ের মত মুখভঙ্গি করে নিশীথ একটার পর একটা ধোঁয়ার বলয় রচনা করে গেল। "কিন্তু এখন যে অনেক অসুবিধে। এই দেখুন না দশটা বই প্রেসে পড়ে আছে, চালু বইই বাজারে দিতে পারছি না, এখনকার ব্যবসায়ে কী যে ঝামেলা—"

"পরে ছাপবেন?" অকম্পিত, নির্লজ্জ, প্রায় প্রার্থনার সুরে সুরপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠোঁটে সিগারেট, নিশীথের গলা তাই বুঝি কেমন ধরা-ধরা শোনাল, "কবে ছাপব ঠিক কথা দিতে পারছিনে যে। দেখুন না, এঁদের কাছেই অপরাধী হয়ে আছি, এখনকার সেরা দু'জন লেখক এখানে বসে আছেন। সর্বেশ মুখুজ্যে, 'মন-আগুন'-এর লেখক। দশ হাজার বই দেড় বছরে কেটে গেছে, লোকে ওঁর নতুন বই চায়।

সেটা আমরা নিয়েছি, কিন্তু দপ্তরী আজও বেঁধে এনে দিল না। কী করি বলুন। ইনি সুবীর মিত্র, সিনেমায় হীট বই 'জীবনদোলা' দেখেছেন, তার লেখক। এখন টালিগঞ্জ ছাড়ছে না, ওদিকে বোম্বাই থেকে ডাকছে। যমে-মানুষে টানাটানি লোকে বলে না? এ ঠিক তাই। 'জীবনদোলা'র বাইশ শ'র এডিশন ফুরিয়ে গেছে, বাজারে নেই বলে ইনি মুখ ভার করে বসে আছেন।"

অনাসক্ত গলায় সুরপতি বলেছেন, "ও"। চশমার পুরু কাচের আড়ালে ওঁর চোখের পাতা ঘনঘন পড়েছে, ওরা দেখতে পায়নি। চেয়ারটা আরও কাছে নিয়ে এসেছে নিশীথ, অতিবিনীত গলায় বলেছে, "এই ত অবস্থা। তার চেয়ে আমি বলি কী সুরপতিবাবু, আপনার বই তুলে নিয়ে আপনি অন্য কোন ঘরে দিন। আমরা কবে ছাপতে পারব ঠিক নেই, কেন খামোখা নিজের লোকসান করবেন।"

"লোকসান, লোকসান," মৃদুস্বরে সুরপতি যেন নিজেকে একবার শোনালেন, তারপর মূর্খের মত হঠাৎ জোর গলায় হেসে বললেন, "আমার আর লাভ কতটুকু বেঁচেছে নিশীথবাবু, যে লোকসানকে ভয় পাব।"

কোনমতে শুকনো একটা নমস্কার সেরে সুরপতি পথে নেমে এসেছেন। দু' পাশে সেই বইয়ের দোকানের সারি। নতুন নাম, নতুন বই, সংখ্যা কত সুরপতি হিসেব করেও বলতে পারবেন না। পুরো তালিকা একমাত্র তাঁর কাছেই আছে, কালের কাঠের ফলকে সাদা খড়ি দিয়ে নিত্য যিনি নাম লেখেন আর মোছেন।

কিন্তু সেজন্যেই, শুধু সেজন্যেই, সুরপতি পরদিনই হাওড়া ইষ্টিশনে গিয়ে টিকিট কিনে গাড়িতে চড়ে বসেননি। আঘাত পেয়েছিলেন বই কি, কিন্তু কেবল ঘা খেয়েই পালাননি। পালিয়েছিলেন অপ্রত্যাশিত পুরস্কারের ভয়ে। সুমিতার বাসায় পরদিন সকালে যদি দেখা করতে না যেতেন, তবে হয়ত অত তাড়াতাড়ি কলকাতা ছেড়ে চলে আসবার কথা ভাবতেন না।

নইলে বই-পাড়ার অভিজ্ঞতার পর মনের সঙ্গে তিনি ত একটা রফা করে নিয়েই ছিলেন। সেদিন মেসে ফেরবার পথে রিক্‌শয় বসে সুরপতি স্বগত বলেছিলেন, "এরা বড় তাড়াতাড়ি ভোলে। আমি আর কোথাও নেই। মুছে গেছি।" "মুছে গেছি" কথাটাই দু'বার উচ্চারণ করেছিলেন, মন্ত্রের মত। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে খেদের খাদটুকু উবে গিয়ে মনের নিকষে নতুন ভাবনার সোনার জলের দাগ পড়েছিল। "মুছে গেছি, ক্ষতি নেই", সুরপতি আবার আহত অন্তরকে বলেছেন, "মুছে গেলেই কি সব মিথ্যে হয়। পাহাড় নিত্য, চিরায়ু।" মেঘে মেঘে আকাশে যে ছবি-লেখালেখি হয়, তা ক্ষণায়ু; কিন্তু দু'টোই কি সুন্দর, অতএব সত্য নয়! ক্ষণকালেও যা সুন্দর, সত্য, তাও শিল্প, যেমন দিনায়ু কুসুম।"

আর এই প্রবোধ মনে স্নিগ্ধ অবলেপের কাজ করেছে। মেসে ফিরে চুপিচুপি সিঁড়ি বেয়ে উঠেছেন। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছেন নিঃশব্দে। খাবার ঢাকা ছিল, ছোঁননি। আলো জ্বালেননি। বালিশে মুখ রেখে ঘ্রাণ নিতে নিতে কখন চোখ জড়িয়ে এসেছে। অনেক দিন আগে দেখা একটি গ্রামের ছেলেকে মনে পড়েছে। মেঝেতে মাদুর ছড়ান, বুকের নীচে বালিশ, সমুখে লণ্ঠন, কাঁপাকাঁপা শিখা। ছেলেটি কী লিখছে। পাঠশালার অঙ্ক অবশ্যই নয়, তাহলে আরেকটি মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াতেই ছেলেটি খাতাটা লুকোতে চাইত না।

"কী লিখছিলি রে?"

"কিছু না, ছড়া।"

"আমাকে পড়ে শোনাবি?"

"পালা।"

"তবে মাসিমাকে বলে দিই?"

বলেনি, মেয়েটি একটু পরে নিজে থেকেই ফিরে এসেছে। "আমাকে নিয়ে ছড়া লিখবি?"

"তোকে নিয়ে ছড়া হয় না। ভাগ।"

এবার কাঁদোকাঁদো হয়েছে মেয়েটির মুখ, পিছন থেকে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরেছে।

"লেখ না একটা; ইস, কী অহঙ্কার। আমার নামে ছড়া বাঁধ। তোমার লেখায় আমি থাকব না?"

তোমার লেখায় আমি থাকব না? জীবনে বারবার নানাজনের মুখে এই আকৃতির প্রতিধ্বনি শুনতে হয়েছে। সেই গ্রামের ছেলেটি বড় হয়েছে, শহরে এসেছে। অঙ্কের খাতায় লুকনো ছড়া নামকরা পত্রিকায় কবিতা, কাহিনীর পরিণত রূপ নিয়েছে। কত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কত ছেলে কতজন তাকে জীবনের কাহিনী শুনিয়েছে। লিখবে তুমি? লেখ না। এমনি ত মরে আছি, লেখার মধ্যে তবু যদি বেঁচে থাকি। সামান্য মরমানুষের অমৃতসাধ। কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা। সে-প্রার্থনা যথাসাধ্য পূরণ করেছে যুবক সুরপতি। একদিন গ্রামের সহচরীকে নিয়ে যে ছড়া বেঁধেছিল, পরবর্তিকালে সে পরিচিতমাত্রের ভিতরে কাহিনীর কুশীলব খুঁজেছে। যে সর্বত্যাগী বিপ্লবী সতীশদা একদিন তার হাতে তিনটি রিভলভার গচ্ছিত রেখে জেলে গিয়েছিলেন, তাঁকেই সুরপতি চাপাগলায়-উচ্চার্য পাড়ায় নীলিমার ঘরে শেষ নিশ্বাস ফেলতে দেখেছে। সেদিন কিন্তু মনে তাঁর কোন কামনা ছিল না; এমন কি, দেশকে স্বাধীন করে যেতে পারলেন না বলে আফসোসও না। শুধু সুরপতির হাত ধরে বলেছিলেন, "আমাদের কথা তুই লিখে রাখিস ভাই। বিফলতা আর সাফল্য, সাহস আর দুর্বলতা তুই-ই দেখাস।"

সুরপতি সে-কথা রেখেছিলেন। সেই বৃহৎ ট্র্যাজেডির কথা লেখা আছে তাঁর পুরনো আমলের বহুপ্রশংসিত একটি দীর্ঘ গল্পে। যা জানেন, যা শুনেছেন, যা দেখেছেন, তা সবই ছিল। এমন কি, শেষ অধ্যায়ের ফকিরচাঁদ লেনের নীলিমাকেও বাদ দেননি।

আজ পীতাম্বর সাহা লেনের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সকলকেই মনে পড়ছে, যাদের ব্যর্থ-সার্থক জীবনের কথা সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন

সুরপতি। কাশী মিত্তিরের ঘাটের সেই সাধু; ওর হাতে গাঁজার কলকে তুলে দিয়ে যে বলেছে, "লেখ্ বাবা লেখ্। আমাকে যে শেষ করেছে সেই শয়তানীর নামে ঢিঢি পড়িয়ে দে বাবা।" সব ছেড়ে নেংটিমাত্র যে সম্বল করেছে, গল্পে ঠাঁই পাবার লোভ তারও কিন্তু কম ছিল না। রোজ আসত লুকিয়ে, গাঁজায় দম দিত আর বলত, জ্বলে মলাম বাবা, পুড়ে মলাম।"

"কেন তুমি শান্তি পাওনি? ভগবানকে পাওনি?"

হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে সাধু বলেছে, "কিছু পাইনি বাবা, কিছু না। শয়তানীটাকে ভুলতে পারলে ত ভগবানকে পাব? তুই ওর সব কথা ফাঁস করে দে রে বাবা, ফাঁস করে দে।"

ময়লাটানা গাড়ির নীচে চাপা পড়ে সাধু যেদিন মারা যায়, তার আগের দিন কিন্তু সে সুরপতির কাছে এসেছিল। ঘামেভেজা বিশ্রী দাড়ি-ঢাকা মুখ সুরপতির কানের কাছে নামিয়ে বলেছিল, "আমি শান্তি পেয়েছি। তুই আর ওর নামে কিছু লিখিসনি বাবা।"

"লিখব না?"

"না।" সাধু ফিসফিস করে বলেছে, "তাকে আজ আমি চাঁদপাল ঘাটে গেরোনের যোগে ভিক্ষে করতে দেখেছি। পাপিষ্ঠার কুষ্ঠ হয়েছে বাবা।"

আরও কত আছে। সকলের কথা আজ রাত পুইয়ে গেলেও ভাবা শেষ হবে না। সুধাদি। চারু। এই মেসের সদানন্দ, যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণের কাহিনী সকলকে ডেকে শোনাত, শুধু একবার ঘোর অসুখের সময় সুরপতিকে চুপে চুপে বলেছিল, "আমাকে নিয়ে একটা গল্প লিখুন। বলুন, লিখবেন? সারা জীবন খালি গাইডবুক আর রেলের টাইমটেবিল মুখস্ত করে লোককে ধাপ্পা দিলাম, আসলে কিন্তু ওতোরপাড়া ছাড়িয়ে যাইনি। আমাদের মত সামান্য কেরানী যারা, তাদের অনেকেই যায় না, যেতে পায় না। এতদিন যত ভ্রমণকাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি, সব ভুয়ো, লিখে

দেবেন এ-কথা, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও লিখবেন যে, আমার নানা দেশ দেখার সাধটুকু কিন্তু খাঁটি ছিল।”

আরও যে কত লোক তাদের জীবনের গোপনতম কথাটি তাকে নিবেদন করেছে। দু' দিনের জীবন নিয়ে চিরদিনের কাহিনী রচনা করুক, সুরপতির কাছে তাদের প্রার্থনা মোটে এইটুকু।

গায়ে টিকটিকি পড়েনি, কড়িকাঠ থেকে উইয়ের বাসাও পড়েনি ঝুরঝুর করে, তবু সুরপতি শিউরে উঠলেন। হৃৎপিণ্ড বারবার কুঞ্চিত প্রসারিত হয়ে কণ্ঠতালু অবধি শুকিয়ে ফেলছে। বুকে চেপে ধরে বালিশটাকে কানে কানে বললেন, “ভুল, সব ভুল। কত অবুঝ ওরা, সাধারণ মানুষ। লেখকের কাছে অমরত্ব চায়, কিন্তু লেখকের নিজের আয়ু ক'দিনের, কেউ ভাবে না ত। মনে রাখে না লেখকও তুচ্ছ মানুষ, তারও মৃত্যু হতে পারে, হয়। যেমন আমি মরেছি।”

“আমি মরেছি।” সুরপতি উচ্চারণ করেছেন ধীরে ধীরে। বালিশের যেখানটায় মুখ রেখেছিলেন সেখানটা সিক্ত হয়ে গেছে, নিঃশব্দে সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন। এই টপটপ নোনতা জলের চিহ্ন কেউ যেন না দেখে, কেউ যেন টের না পায়।

তবু যদি পরদিন সকালে জামাটা ছাড়তে গিয়ে খুচরো পয়সা ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ত। কিংবা, পয়সা পড়েছিল ক্ষতি নেই, চিরকুটটা যদি পকেটেই থেকে যেত। আর সেই চিরকুটে যদি সুমিতাদের বাসার ঠিকানা লেখা না থাকত। এতগুলো যদির বাধা যখন ঘুচলই, তখন সুরপতি যে ফের জামাটা ফিরিয়ে পরবেন, পথে রিক্‌শ নেবেন একটা এবং শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেন খুঁজে বের করে তার ষোল বাই দুই বাই এফ নম্বরের বাড়ির দরজায় টোকা দেবেন, একে প্রায় নিয়তি বলা চলে।

নিয়তি বই কি। নইলে সেদিনই হয়ত সুরপতিকে কলকাতা ছাড়তে হত না।

হাওড়া ইস্টিশনের এলাকা ছাড়বার পর প্রথম শ্রেণীর একটা

গাড়ির কামরায় আধশোয়া সুরপতি মনে মনে সেদিন সকাল-বেলাকার ঘটনা আবার রচনা করে নিজেকে শুনিয়েছিলেন।··· দু'য়েকটি রূপোলী চুল সামান্য যা একটু বিভ্রম ঘটিয়ে থাকবে, নইলে টোকা দিতেই যে দরজা খুলে দিয়েছিল, হলুদমাখা আঁচল আর কনুইয়ের কাটা দাগ থেকেই তাকে তোমার চেনার কথা। "সুমিতা ?" কতকটা ভয়ে কতকটা ভরসায় জিজ্ঞাসা করেছিলে। সে জবাব দেয়নি, একটু পরে একটি ছোট মেয়ে এসে তোমাকে ডেকে নিয়ে গেছে। বসবার ঘর নয়, এদিক ওদিক তাকালেই বোঝা যায় এটাও শোবার, তাড়াতাড়ি করে এটাকে একটা বসবার ঘরের চেহারা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ কোথা থেকে একটা টেবিল টেনে এনে রাখা হয়েছে ঘরের ঠিক মাঝখানে, একমেব চেয়ারও আছে, কিন্তু তুলো ঝুরঝুর তোশকটাকে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয়নি। ছেঁড়া মাদুরটায় লজ্জা নিবারণ করে, সেটাও ঘরের এক কোণে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে। "এই খুকি শোন।" মেয়েটিকে কাছে ডেকে তুমি আলাপ করতে চেয়েছ। একেবারে ছোট মেয়ে হলে পালিয়ে যেত, কিম্বা কিশোরী হলেও ; কিন্তু দশ এগার বছরের এই মেয়েটির সঙ্কোচ স্বভাবত কিছু কম, সে একবার ডাকতেই কাছে এসেছে। যথারীতি তার নাম, পড়াশুনার খবর জেনে নেবার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছ, "বলত আমি কে।" মেয়েটি একবারও না ভেবে বলেছে, "মামা।" অবাক হয়েছ বই কি, মেয়েটির সপ্রতিভতায়, না, সম্পর্কের আকস্মিকতায়, বলা যায় না। "মামা ? কে বলেছে ?"

"বারে, মা বলে দিল যে। তা ছাড়া তুমি ত, আপনি ত লেখেন।"

"লিখি ?" (তুমি যে লেখ একথা আর একজনের মুখে কত দিন পরে যে শুনলে !) "লিখি ?" জিজ্ঞাসা করলে আবার। "কে বলেছে।"

"আপনার বই আছে যে আমাদের আলমারিতে। মা মাঝে মাঝে খুলে দেখে, মুছে রাখে। একটাতে মার নাম লেখা, আপনি

লিখে দিয়েছেন, মা বলেছে। আর ছ'টোতে কিন্তু কিছু লেখা নেই। এবার আপনি নাম লিখে দিয়ে যাবেন ত ?"

"যাব।" অভিভূত গলায় শুধু একটি কথা বলতে পেরেছ।

আর ঠিক তখনই সুমিতা এসেছে। হলুদমাখা শাড়িটা বদলাতে পারেনি, কনুইয়ের সেই কাটা দাগটা লুকোতেও না, তবু ওরই মধ্যে যা একটু ফিটফাট। হয়ত তোমার জন্যে চায়ের জল চড়িয়ে কলতলায় গিয়ে ভিজে গামছায় মুখটাই শুধু মুছে আসতে পেরেছে। বয়স হয়েছে বোঝা যায়, তবু শ্রীটুকু পুরোপুরি ঘোচেনি, বিশেষত হাসিটুকু সেই পনের বছর আগেকার।

"অনেকদিন পরে এলে।"

"হ্যাঁ, অনেকদিন।" আর কী বলা যায় ভেবে না পেয়ে ওর কথাটাই তুমি ফিরিয়ে দিলে। আর আঁচলে হাত ঘষে ঘষে ও আঙুলগুলো পর্যন্ত হলদে করে ফেলল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর তুমি নিজেই আবার বলেছ, "কলকাতায় থাকি না ত, তাই সব সময় খবর নেওয়া হয়ে ওঠে না। তোমরা ভাল আছ ?" নাম ভুলে গিয়েছিলে বলে সুমিতার স্বামীর কুশল আলাদা করে জিজ্ঞাসা করা হল না।

"ভাল আছি। তুমি যে ভাল আছ দেখতেই পাচ্ছি। হবে না কেন," বিষণ্ণ একটু হাসি জুড়ে দিয়ে সুমিতা বলেছিল, "তোমার এখন অনেক টাকা, দেশজোড়া নাম।"

গরম লাগছিল, তুমি একবার হুকহীন সীলিঙের দিকে অসহায় চোখে তাকালে, তারপর রুমাল বার করলে পকেট থেকে। সুমিতা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতপাখা নিয়ে এল, বোধ হয় রান্নাঘর থেকে, কেন না তার ডাটে কয়লার গুঁড়ো লেগে ছিল বলে তুমি ধরতে পারলে না। পারলেও অবশ্য সুমিতা পাখাটা তোমার হাতে দিত না, নিজেই হাওয়া করত।

"তোমার আরও নিশ্চয় অনেক বই বেরিয়েছে, একখানাও ত

দাও না। একটা তুমি সেই ষোল বছর আগে দিয়েছিলে, তোমার প্রথম বই, আর দু'টো আমি কিনেছি।"

"কিনেছ!" উৎফুল্ল হয়েও আহত হবার ভান করেছ।

"কিনেছি। দেখবে? এস না এদিকে। এটা আমার বিয়েয় পাওয়া আলমারি, কাচ ভেঙেছে, রঙ চটে গেছে, তবু এইটুকুই যা চিহ্ন আছে। অনেক বই পেয়েছিলাম ত, সব গেছে, লোকে পড়তে নিয়ে ফেরত দেয়নি, শুধু এই শরৎ-গ্রন্থাবলীটা কী ভাগ্যে টিকে আছে। এই দেখ।"

ওর দৃষ্টির পিছু পিছু গিয়ে তোমার চোখ দেখেছে, ভাঙা আলমারির কাপড়, পুতুলের স্তূপের ধারে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পাশে সযত্নে রাখা তোমার তিনখানি বই।

অপরাধী গলায় সুমিতা বলেছে, "আর কিনতে পারিনি। সংসার বড় হয়েছে, নানা অসুখ-বিসুখ। কী করব, ছেলেমেয়েদের তোমার এই তিনখানা বই-ই দেখাই, তোমার মত হতে বলি।" একটু থেমে সুমিতা ফের জিজ্ঞাসা করেছে, "তোমার আর কী বই বেরিয়েছে বল ত। সিনেমা হয়েছে?"

কাচের আলমারিতে সাজান তোমার বই দেখার পরে কী নেশাই চোখে লেগেছিল, অনায়াসে তাই বলতে পারলে, "হয়নি, এবার হবে। সেই কনট্রাক্ট করতেই ত কলকাতায় আসা।"

"আমরা পাশ পাব ত।" হঠাৎ কী করে মধ্যবয়সী মেয়েটি একেবারে কিশোরী হয়ে গেছে, আবদারের সুরে বলেছে, "আমরা সবাই যেন পাশ পাই। আর, তোমার নতুন বইগুলো দেবে না?"

"দেব।" সম্মোহিতের মত বলেছ, "দেব। নতুন এডিশন সবে ছাপা হয়ে এসেছে। কাল দিয়ে যাব।"

সুমিতার মুখেচোখে ছেলেমানুষী খুশি। "কাল আবার আসবে তুমি? তা হলে কী ভাল যে হয়। কাল রবিবার, ওঁর সঙ্গেও দেখা হবে। তুমি এখন অনেক বড়, বলতে ভরসা পাইনে, এসে ওই সঙ্গে যদি দু'টি ঝোলভাত—"

অনেকক্ষণ ধরেই একটু একটু করে ঘামছিলে, এর পরে আর বসে থাকতে পারনি, হঠাৎ, এক রকম বিনা নোটিসে, উঠে দাড়িয়ে বলেছ, "সে হবে এখন, সে হবে। এখন চলি।"

সুমিতা দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছে।

"আরও একটা কথা আছে।"

সবে চৌকাঠের ওদিকে পা দিয়েছিলে, হঠাৎ থেমে গেছ। ঘোমটা কখন খসে গেছে, আরও একটু কাছে এসেছে সুমিতা। "আরও একটা কথা আছে। তুমি বোধহয় শুনে হাসবে, ভাববে ছেলেমানুষী। আমার মনে একটা ক্ষোভ রয়ে গেছে কিন্তু। এতজনকে নিয়ে এত কথা লিখলে, আমাদের কথা কোনটাতে আজও লেখনি।"

ভাঙা সুইচে যেন হাত ঠেকেছে এমন চমকে উঠেছ। সে-চমক কাটিয়ে উঠতে অবশ্য সময় নাওনি। কণ্ঠস্বরে একটু বা পরিহাসের ছোঁয়া লাগিয়ে বলেছ, "সব ক্ষোভ কি শেষে তোমার ছোট্ট এই একটুখানি দুঃখে রূপ নিয়েছে সুমিতা। কিন্তু কী লিখব বল ত?"

কিছু লেপটে-যাওয়া সিঁদুরে, কিছু লজ্জায়, সুমিতার মুখখানা লালচে লাগছে। আড়ষ্ট স্বরে বলেছে, "কেন, আমাদের কথা। তোমার সাহিত্যে এই হলুদমাখা আঁচল আর কনুইয়ের কাটা দাগটার কথা লেখা রইলই বা।"

এবার আর পরিহাস নয়, কঠিন গলায় বলেছ, "ভয় করবে না?"

"কিসের ভয়?"

"কেন, কলঙ্কের।"

অনেকক্ষণ পরে সুমিতার মুখে চকিত বিদ্যুতের মত এক ঝিলিক হাসি দেখা গেছে। "সে-ভয় থাকলে তোমার-হাতে-আমার-নাম-লেখা বই কি আলমারিতে সবাইকে দেখিয়ে রাখি।"

অপলক সেই চোখের দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারনি। মাথা নিচু করে চলে আসতে যাবে, জামার হাতায় আলগোছ টান লেগে আবার ফিরে তাকিয়েছ। দেখেছ সেই দৃষ্টি আর নেই

সুমিতার চোখে, খর রৌদ্র ছায়া-কোমল হয়েছে। গাঢ়, অশ্রুতপ্রায় গলায় সুমিতাকে বলতে শুনেছ, "আর শোন, যদি কিছু লেখ তবে তাতে আমার ডাকনামটাই দিও,—ঝিনুক। বাপের বাড়িতে যে-নাম ছিল। ও-নামে এখানে কেউ ডাকে না।"

কামরার বাইরে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিপরীত দিকে দ্রুতসরন্ত গাছপালা, তারের খুঁটির দিকে চোখ রেখে সুরপতি আবার আপনাকে বললেন, "এর পরে এক বেলাও কলকাতায় থাকা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বইয়ের বাজারে যা-লেবে-তা-তু-টাকার নিলামে তোমার দেউলে হবার খবর কী এক আশ্চর্য কারণে শিবদাস রাহা সেকেণ্ড লেনের একটি অধিবাসিনীর কাছে অজানা থেকে গেছে। সেখানে আলমারিতে শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাশেই তুমি। কিন্তু আর ছু'দিন থাকলে কি কিছু জানাজানি হত না! পরদিন সকালে সুমিতার বাসায় খালি হাতেই ত যেতে হত। গিয়ে কী কৈফিয়ত দিতে। প্রাণ গেলেও কি তাকে বলতে পারতে লেখক সুরপতি মরে গেছে, তার বই আর কোনদিন ছাপা হবে না? হয়ত মুগ্ধ একটি মেয়ের নির্জলা স্তুতি শুনতে শুনতে তোমার নিজের বিবেকই মাথা তুলে দাঁড়াত, দুর্বল কোন মুহূর্তে স্বীকার করে বসতে, নতুন বই নয়, ছায়াছবির চুক্তি নয়, শুধু রেলের ঠিকেদারির তদ্বির করতেই দূর প্রবাস থেকে এতদূরে এসেছ। সত্যের রোমশ হাত থেকে একটি মিথ্যাকে বাঁচাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছ সুরপতি, ভালই করেছ।"

সেই রাত্রি

সেই স্তম্ভিত, পাথরের মত ভারী রাত্রিটিতে ওরা পরস্পরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করেছিল। মা আর দাদা আর বড়দি, বউদি আর ছোড়দি, প্রত্যেকে প্রত্যেককে।

মানুষগুলো, মনে আছে, সেই ঘোলাটে-আলো মিটমিটে ঘরে হঠাৎ কেমন যেন ছোট হয়ে গিয়েছিল। ছোট, নিষ্ঠুর আর আলাদা। লঘু-গুরু মানেনি, সম্পর্কের বাছ-বিচার করেনি।

রাত্রিটির স্মৃতি ময়লা একটা ছবি হয়ে মনে এইভাবে টিঁকে আছে : ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা হ্যারিকেন, কালির ভেজাল মিশিয়ে বরাবর যেটা আলো বিলোয়, সেদিনও বিলিয়েছে। আলোটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমরা সবাই, সকলেই সকলের আপন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কথাটা কারুর মনে নেই। কয়েকটা বন্যজন্তু যেন হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে গোঁ-গোঁ রোষে রেঁায়া ফোলাচ্ছে। জোনাকির মত একরকমের আলো সকলের চোখে : সবুজ-সবুজ, আবছা। .

বাইরের হাওয়া থেকে থেকে জানালার পাল্লাটার টুঁটি টিপে ধরেছে, আমরা, আমি রিনু, অস্থির হয়ে এ ওর মুখের দিকে চেয়েছি, কথা বলতে সাহস হয়নি ত, শুধু বোবা-চোখের মিনতি দিয়ে বলতে চেয়েছি, ‘বড়দি, বউদি, তোমরা চুপ কর।’ দাদা মাঝে মাঝে হেঁকে বলেছেন, ‘ছোটরা এখানে কেন, যাও, চলে যাও, বড়দের কথায় কেউ থেক না,’ আমরা তবু পালাইনি, এ ওর মুঠি ধরে সরে সরে বসেছি, কেন থাকব না আমরা, কেন, কেন, এ-বাড়ি কি আমাদেরও নয়। বড়রা বিশ্রীভাবে ঝগড়া করলে দোষ হয় না, যত দোষ কি ছোটরা সে-কথা শুনলে!

মনে আছে, বউদি একবার চাপা গলায় কিন্তু ঝাঁজ মিশিয়ে দাদাকে বলে উঠল ‘মর, মর তুমি’ তার উত্তরে দাদা, যাঁকে বরাবর

নিরীহ, মিনমিনে বলে জানি, যে-ভাবে খেঁকিয়ে উঠে এগিয়ে এলেন, বউদি পালাতে পথ না পেয়ে বড়দিকেই একটা ধাক্কা দিল, দেয়ালে ঠোকর খেয়ে বড়দির কপালের কাছটা উঠল সুপুরির মত শক্ত হয়ে, আর বউদির বারো মাস রোগে ভোগা বাচ্চাটার ট্যাঁ ট্যাঁ কান্না থমথমে আবহাওয়াটা সূতো-মুখ ছুঁচের মত ফুঁড়ে ফুঁড়ে সেলাই করে গেল।

ঘরের এক কোণে কাঠ হয়ে আমি, রিনু আর মিনু ঠকঠক হাঁটুতে থুঁতনি রেখে দেখেছি। মেঝেয় নিরুপায় নখ টেনে টেনে ছিঁড়েছি হঠাৎ যারা ভীষণ হয়ে গেছে সেই বড়দের ভূতুড়ে ছায়া।

অথচ বিকেলের ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে, সন্ধ্যার ফুরফুরে হাওয়ায় এই রাত্রিটির আভাসও ছিল না।

ইস্কুল থেকে অন্যদিনের মতই শোরগোল করে ফিরেছি। মা রান্নাঘর থেকে ডেকে বলেছেন, খাবি আয়, আর আমরা জামা-কাপড় না ছেড়েই এমন কি হাত-পায়ে জলটুকুও না ঢেলে ছুটে গেছি, মাকে ঘিরে বসেছি। রিনু কিনা সবচেয়ে ছোট, সে মার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছে, 'কই কী দেবে দাও।'

মা বলেছেন 'কী আবার, মুড়ি।'

মুড়ি, শুধু মুড়ি ?

রিনু সব চেয়ে ছোট ; ছোট বলেই অবুঝ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নেড়ে বলেছে, 'হবে না, আজ সকালে রসগোল্লা আনিয়ে রেখেছ, দেখেছি। আমাদের দাও।' আর কীর্তনে যেমন দোহার ধরে, সায় দিতে আমরাও তেমনি হাততালি দিয়ে বলেছি, 'হবে না, হবে না। দাও, আমাদের দাও।'

মা এবারে রেগে গেছেন। 'ছি তোরা কী ! আজ মায়া আসবে না ? সারা সপ্তাহ খেটেখুটে দু-দিনের জন্যে জিরোতে মেয়েটা আসে, তার জন্যে লুকিয়ে দু'টো রেখেছি, তাতেও চোখ দিলি ?'

মায়া, মানে আমাদের বড়দি।

আমরা মুহূর্তে চুপ করেছি। ফিস ফিস করে বলেছি, 'বড়দি বুঝি আজ আসবে, মা ?'

'আজ শনিবার না ?'

রিনুর জন্যে ফ্রক আনবে ? আনবে। আমার বই ? আনবে। মিনুর জামার ছিট ? তাও আনবে বৈ কি।

ছোড়দি কোথায় ছিল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে। কুণ্ঠিতভাবে বলেছে, 'আর মা, আমার জন্যে ? কানের সেই জিনিসটা আনবে না ? যেটার প্যাটার্ন বদলাতে দিয়েছি ?'

জেরায় জেরায় অস্থির হয়েই হয়ত মা রূঢ় গলায় বলে উঠেছেন, 'আনবে বাছা আনবে। লেখাপড়া ত শেখোনি, শুধু গহনার ফূর্তি নিয়েই আছ।'

সব কথায় ফোঁড়ন দেওয়া বউদির বরাবরের অভ্যাস, আজও সুযোগ ছাড়ল না, পিছন থেকে বলে উঠল, 'সত্যি ভাই, তুমি যেন কী। নিজে বিয়ে না করে তোমার বিয়ের খরচ দিচ্ছে বড় ঠাকুরঝি, আর সামান্য একটা কানের দুল বদলে আনবে না ? বরং খোকনের টনিক ওষুধটার কথা ভুলে না গেলে বাঁচি।'

সায় পেয়েও মা খুশি হলেন না, শুকনো গলায় বললেন, 'মায়া সংসারের কোন্ দরকারী কথা কবে ভুলেছে, বউমা ?'

অপ্রতিভ হয়ে বউদি বলেছে, 'ভোলেনি মা।'

'তবে বল কেন। দেখছ ত নিজের চোখে; ওই ত কাঁচা বয়সের একটা মেয়ে, নিজের সাধ-আহ্লাদ বলতে কিছু রাখেনি, রঙিন শাড়িটাও পরে না, গহনা বলতে একগাছি চুড়ি পর্যন্ত নেই, একটা হাতঘড়ি কিনেছে বটে, সেও কাজে লাগে বলে, সারা সপ্তাহ কলকাতায় হোস্টেলে থেকে মুখে রক্ত তুলে খাটে, কার জন্যে বউমা ? এই সংসারের জন্যেই। সপ্তাহের শেষে এক দিনের জন্যে বাড়িতে যা জিরোতে আসে, শখ যদি বল, তবে এইটুকু শখ নিজের জন্যে রেখেছে।'

তারপর ঝিঁঝি ডেকেছে, জোনাকির চোখে চোখে সন্ধ্যা

জ্বলেছে। কুয়োতলায় বসে আমরা সেদিন অনেকক্ষণ ধরে শুধু বড়দির কথাই ভেবেছি।

বলেছি, 'তোর মনে আছে মিনু ?'

'কী ?'

'সেবারে এখানে দাঁড়িয়ে বড়দি ছোড়দিকে যা বলে গিয়েছিল ?'

'আছে।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, কিন্তু মনে পড়ে গেল সবই। ছোড়দিই বুঝি বড়দিকে নির্জন বলে কুয়োতলাতে ডেকে এনেছিল। এনেছিল কিন্তু অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারেনি। বড়দিই তাড়া দিয়েছে, 'কই, কি বলবি বল।' তবু খানিক চুপ করে থেকে, থেমে থেমে ছোড়দি বলেছে, 'আমার একটা ব্যবস্থা করে দে, দিদি ?'

বড়দি হেসে উঠেছে। 'কিসের ব্যবস্থা রে, বিয়ের ?' ছোড়দি লজ্জা পেয়েছে, তবু অভিমান ধরা গলায় বলেছে, 'তুই ত হাসবিই। শরীরে খুঁত নেই, লেখাপড়া শিখেছিস, নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিস। আমার দশাটা ভেবে দেখেছিস কখনও ? একে মুর্খ, তাতে একটা পা ছোট, টেনে টেনে চলি। মা মারা গেলে কী হবে আমার, কোথায় থাকব ? দাদার অবস্থা ত দেখতেই পাচ্ছিস, টুকটাক কী করে ওই জানে, নিজের বউ আর বাচ্চাটাকে পর্যন্ত খেতে দিতে পারে না।'

বড়দি আর হাসেনি। কুয়োর নীচেকার জলের দিকে চোখ রেখে বলেছে, 'বেশ, ছায়া, তোর বিয়ে ঠিক হোক, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে ধার করে বা যেমন করে হোক, খরচ আমি দেব।'

ছোড়দির বড় বড় চোখ দু'টি ছল ছল করে উঠেছে, বলেছে, 'আর দিদি তুই ?' বড়দি অন্যদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বলেছে, 'আমার আবার কী। যেমন চলেছে তেমনি চলবে।'

ইতস্তত করে ছোড়দি আবার বলেছে, 'সংসার, বিয়ে টিয়ে, এই সব ?' এতক্ষণে বড়দিকে তরল গলায় হাসতে শুনেছি। 'বিয়ে

টিয়ে দূরের কথা, নিজের সম্পর্কে এখন অবধি কোন কিছুই ভাববার সময় পাইনি ছায়া।'

'তোর সাধ বলে কিছু নেই ?'

'না। কী করেছি জানিস ? সব সাধ আর ইচ্ছে একটা কৌটোয় পুরে এই কুয়োর জলে একদিন ফেলে দিয়েছি।'

সেই বড়দি আসছে।

সন্ধ্যার একটু পরে বৃষ্টি নামল, জোরে নয়, ফোঁটা ফোঁটা, তাতেই আমাদের শহরতলীর রাতকানা গলির কোণের টিমটিমে মিউনিসিপ্যাল বাতিটা ঝাপসা হয়ে এল।

মা একবার জানালায় এসে পথের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন। ছট্‌ফট্‌ করেছেন, মাঝে মাঝে বলেছেন, 'মায়া তবে বোধ হয় বিকালের গাড়িটা ধরতে পারেনি। নইলে এতক্ষণ এসে যেত।'

দাদা কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির হয়েছে। কলাপাতায় জড়ান গোটা কয়েক বকফুল রেখেছে চৌকাঠের ওপর। মা বলেছেন, 'এ কী রে।' লজ্জিত গলায় দাদা জবাব দিয়েছে, 'আজ মায়া আসবে না ? ও যে বকফুল ভাজা খেতে ভালবাসে।'

হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে মা আমাদেরই—আমরা যে এত ছোট, তবুও সাক্ষী মেনেছেন।—'ছোট বোনের ওপর টান দেখেছিস ? কী খেতে ভালবাসে, খুঁজে খুঁজে নিয়ে এসেছে। আমি আর ক'দিন। ভাই-বোনের এই ভালবাসাটুকু বরাবর যেন থাকে বাবা।'

অপ্রতিভ দাদা পালাতে পথ পায়নি।

আরও কিছু পরে শোবার ঘরে মাদুর পেতে আমরা সকলে গোল হয়ে বসেছি। হ্যারিকেনটা আছে মাঝখানে সাক্ষী, আমাদের সম্মুখে বইয়ের পাতা খোলা। হাত-পা ধুয়ে দাদা তক্তপোশে বসেছে পা ঝুলিয়ে। মা-ও একটু পরে পাশে এসে বসেছেন।

আগেই বলেছি, বইয়ের পাতা খোলা, কিন্তু ওই খোলাই।

আমরা পড়ছি না ত, উৎকর্ণ হয়ে আছি। জানি, এই সময়টাতে মা-দাদাতে মিলে সংসারী কথা হয়, তার কিছু কিছু আমাদেরও কানে আসে, শুনে শুনে শোনাটাই আমাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। ঠোঁটে আঙ্‌ল রেখে আমরা বলেছি, 'চুপ্‌, চুপ।' রিনু, মিনু আর আমি।

মাকে বলতে শুনেছি, 'ছায়ার বিয়েটা তাহলে এখানেই ঠিক করি? খুব ভাল ঘর-বর অবশ্য নয়, তবে গেরস্ত ঘর, খাওয়া-পরার দুঃখ হবে না। তা ছাড়া খুঁতো মেয়ে, এর চেয়ে ভাল বর পাচ্ছিই বা কোথায়?'

দাদা বলেছে, 'টাকা?'

'মায়া বলেছিল ত সে-ই দেবে। অফিস থেকে ধার করে। কত টাকা চাই, সে-হিসাবও মোটামুটি করে ফেলেছি। মায়া আজ এলে ওর সঙ্গে বসে হিসেবটা একবার দেখিস বাবা।'

দেখতে পেয়েছি, ছোড়দি দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। আমাদের ইশারায় মিনতি করে বলেছে, 'বলিস না, বলিস না।' ওর বিয়ের কথা কি না, চুরি করে শোনবার লোভটুকু সামলাতে পারছে না। এক একবার এসে দাঁড়াচ্ছে, মুখে আঁচল, কপাটে কান, আবার পা টেনে টেনে চলে যাচ্ছে ও-ঘরে, বউদির রোগা টিঙটিঙে বাচ্চাটাকে চুমোয়-চুমোয় অস্থির করে তুলছে।

দাদা বলেছে, 'মায়া টাকা দেবে ছায়ার বিয়ের? আরে আমি আর সতীশ মিলে অর্ডার সাপ্লাইয়ের নতুন যে কোম্পানী খুলব ঠিক করেছি, তার জন্যে মায়ার কাছে কিছু টাকা চাইব ভেবেছিলুম যে। মায়াকে আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টর করে দেব। ও এলে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো না মা।'

মা বলেছেন, 'ছি। এমনিতেই ত কত টাকা দিচ্ছে সংসারে। ছোট বোনের কাছ থেকে আর টাকা নিতে নেই বাবা। তা-ছাড়া ছায়ার বিয়ে হয়ে যাওয়াটাও যে খুব দরকার, সোজা কথাটা বুঝছ না?'

শুনেছি, মা চোখ বুঁজে গদ্‌গদ গলায় বলে গেছেন, 'এই বিয়েটা চুকে যাক, তারপর আমি আমার বড় মেয়েরও বিয়ে দেব। বাছা আমার কত দিন যোগিনী হয়ে থাকবে। তুই তখন খরচাটা চালিয়ে নিতে পারবি না?'

মাথা চুলকে দাদা এদিক ওদিক চেয়েছে। —'পারব মা!'

হঠাৎ ভয় পেয়ে মিনু যখন চেঁচিয়ে উঠেছে, 'সাপ, সাপ,' তখনও বড়দি এসে পৌঁছয়নি। দাদা আর মা ছুটে এসেছে। সাপ? কোথায় সাপ। হ্যারিকেনটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা হল, কিছু ত নেই। জড়োসড়ো হয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে এ ওকে আঁকড়ে ধরে কেঁপেছি, মিনু, লজ্জিত, বিব্রত, কাঁদোকাঁদো হয়েছে, 'পায়ের পাশ দিয়ে ঠাণ্ডা কী একটা গেল যে।'

তখন দেখা গেল, সাপ ত নয়, জল; জলের স্রোত। ছাদের একটা কোণে কবে ফাট ধরেছে, টের পাইনি, আজ এতক্ষণ ধরে মেঝের অন্ধকার কোণে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েছে, এখন আমাদের পড়বার জায়গাটুকুর পাশ দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে নর্দমার দিকে।

সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মা বলেছেন, 'বাসাটা ত বদলাতে হয়, বলাই। কবে দেয়াল চাপা পড়ে মরব ঠিক নেই।' ও-ঘরে অনেকক্ষণ ধরে বউদির বাচ্চাটা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদছিল আর কাশছিল। মা বলেছেন, 'ওই শোন্। ও-ঘরটাও যে স্যাঁতস্যেঁতে, বুকে সর্দি বসেছে, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, ঘুমোতে পারে না।'

শুকনো, হয়ত ঈষৎ বিরক্ত-গলায় দাদাকে বলতে শুনেছি, 'বুঝি ত সব, কিন্তু করব কী, বল?'

আর ঠিক তখনই আমরা সকলে, মনে হল সকলেই একসঙ্গে বড়দিকে দেখতে পেয়েছি। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জুতো ছাড়ছে।

মা তাড়াতাড়ি একটা তোয়ালে দিলেন ছুঁড়ে, 'মাথাটা মুছে নে। ইস, একেবারে নেয়ে এসেছিস, জামা-কাপড়টাও ছেড়ে ফেল্। আগের গাড়িটা বুঝি ধরতে পারিসনি?'

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল বড়দি, আর আমরা একটু ভয়ে একটু কৌতূহলে ওকে মিটমিট করে দেখতে থাকলুম। মিটমিট করে, কেন না বড়দির দিকে সোজাসুজি চাইতে কোন দিনই সাহস হয় না, সেদিনও হয়নি। ফী শনিবারে যেমন, আজও বড়দি তেমনি। তেমনই করুণ, গম্ভীর, ক্লান্ত। আঁচলে বার বার মুখ ঘষছে, বোধ হয় এত পথ হেঁটে এসে ঘেমেছে, মা হাত-পাখা নিয়ে পাশে দাঁড়ালেন।

'এবারে হাতমুখ ধুয়ে আয়। কিছু মুখে দিবি?'

প্লেট থেকে রসগোল্লা ভেঙে ভেঙে নিজেই বড়দিকে খাইয়ে দিতে গেছেন মা, বড়দি লজ্জায় পড়ে খালি মাথা নাড়ছে, কিছুতে মুখ তুলবে না, বার বার বলেছে, আমার হাতে দাও না, আমি খেতে জানি, মাও ছাড়বেন না—এই মধুর দৃশ্যটুকু ভোলবার নয়। একটু দূরেই লুব্ধ, বিস্মিত আমরা সার দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম যে। রিনু, মিনু আর আমি!

এই সময়ে, নিয়ম এই যে, আমরা বড়দির কাছে যাব না। বড়দি ইশারায় ডাকলেও না। কেন না, গেলেই নিজের খাবারের থেকে আমাদের ভাগ দেবে বড়দি। মা বকবে।

আমরা বড়দির কাছে এসেছি। দূর থেকে বড়দিকে মনে হয়েছিল শুধুই ক্লান্ত, কাছে গিয়ে দেখেছি একটু খুশি খুশি ভাবও মুখের কোন্‌খানটাতে যেন লুকোন রয়েছে।

রিনুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বড়দি বলেছে, 'কী রে পড়তে বসিস নি আজ?'

আদর পেলে রিনু আরও যেন ছেলেমানুষ হয়ে যায়, আধো-আধো গলায় কথা ফোটে কি ফোটে না। আমরা তাই তিন জনেই এক সঙ্গে বলেছি, 'বসেছিলাম বড়দি, কিন্তু ছাদ থেকে জল পড়ল যে!'

আমাদের কথা কেড়ে নিয়ে মা বললেন, 'সত্যি, মায়া বাড়িটা

বড় পুরোন হয়ে গেছে, কবে কি হয় বলা যায় না। অসুখ ত লেগেই আছে। বাচ্চাটা সেই থেকে কেমন কাশছে, শুনছিস না?'

'শুনছি ত।'

'তুই ত কবে থেকে বলছিস, আমিই এতদিন গা করিনি। এখন ভেবে দেখছি মায়া, তোর কথাই ভাল, ছায়ার বিয়েটা চুকে গেলে কলকাতায় আমাদের সকলের জন্যেই ছোটখাটো একটা বাসা দেখ। এ-বাসায় আর চলে না।'

বড়দি অন্যমনস্ক সুরে বলেছে, 'বেশ ত। কিন্তু দাদা—দাদার বিজনেস কী হবে?'

বউদি কখন এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ভারী ত বিজনেস। ঘরে কোনদিন পয়সা ত আসতে দেখি নে। বাচ্চাটা ত আগে বাঁচুক, আমরা ত প্রাণে বাঁচি। ঠাকুরঝি, তুমি কলকাতায় বাসা ঠিক কর। আর শোন'—বড়দির কানের কাছে মুখ নামিয়ে বউদি বলল, 'তোমার দাদা ব্যবসার জন্যে তোমার কাছে কিছু টাকা চাইবে। কক্‌খনো দিও না।'

হালকা অলস ভঙ্গিতে দু' হাত তুলে বড়দি হাসল। 'ক্ষেপেছ। কিন্তু এবার খেতে দাও ত, মা? ঘুম পেয়েছে, সত্যি।'

হ্যারিকেনটা ঘিরে পাতা পড়েছিল। সপ্তাহে এই একটা দিন আমরা এক সঙ্গে খেতে বসতুম। মা নিজের হাতে পরিবেশন করতেন।

বড়দের খেতে সময় লাগে। ওরা খায়, গল্প করে খায়। আমরা ছোটরা কয়েক গ্রাসে পেট পুরে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি, শুয়ে পড়েছি ঢালা বিছানায়।

যতদূর মনে পড়ে, মিনুই প্রথম কথাটা তুলেছে। ফিস-ফিস করে বলেছে, 'বড়দি কেমন একটু বদলে গেছে, দেখেছিস!'

'বদলে গেছে? কই, দেখিনি ত'!'

'কেন, ওই যে হাতের দু-গাছি চুড়ি। বড়দিকে কখনও এসব কিছু পরতে দেখেছিস।'

রিনু সায় দিয়ে বলেছে, 'আর তেল। কী তেল যে আজ মেখে এসেছে বড়দি। আমি ত ওর পাশেই বসেছিলুম। জানিস, মাথা ঝিম-ঝিম করে আমার ঘুম এসে গিয়েছিল!'

তখনই কানে এল, বড়দি খিল-খিল করে হাসছে। অনভ্যস্ত বলেই কানে একটু বেসুরো লেগেছে। মনে হয়েছে, বড়দিকে এতখানি শব্দ করে হাসতেও কি কখনও দেখেছি!

বালিশের আড়াল থেকে চুরি করে চেয়ে দেখেছি, মা আস্ত একটা কলা ছাড়িয়ে দিয়ে গেছেন বড়দির দুধের বাটিতে, আর কপট আতঙ্কে দু-হাত তুলে বড়দি মিনতি করে বলছে, 'না, না।'

নিস্তেজ হ্যারিকেনটা ঠোঁট টিপে হাসছে।

কেন না, একটু পরেই কী ঘটবে সে বুঝি জানত। জানত যে, মধুর এই ছবিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। স্নেহ-প্রীতি-মায়ার টানে বাঁধা কয়েকটি মানুষ স্বল্পালোক ঘরে বাঘের মত জ্বলজ্বলে চোখে পরস্পরের দিকে তাকাবে আর হাঁপরের মত হাঁপাবে।

এখনও স্পষ্ট মনে আছে, মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েও বড়দি চৌকাঠের উপরে থমকে দাঁড়িয়েছে। একটু চমকে গেছেন মা-ও। তাড়াতাড়ি বড়দির শখের থলিটাকে পিছনে লুকিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু বড়দির কিছু চোখ এড়ায়নি। ভুরুতে কুঞ্চন এবং গলায় বিরক্তি ফুটেছে। 'ও কী মা, ও কী, আমার ব্যাগ খুলেছ কেন।'

মা ধরা পড়ে গিয়ে ঢোঁক গিলেছেন, সত্যি-মিথ্যা জড়াতে গিয়ে এলোমেলো ভাবে বলেছেন, 'খুলেছি? কই না-ত। ও হ্যাঁ, দেখেছিলাম কেমন জিনিসটা, চাবি ছাড়াই খোলে কিনা। ক-টা খুচরো পয়সার দরকার ছিল।'

শুকনো গলায় বড়দি বলেছে, 'পয়সার দরকার ত আমার কাছে চাইলে না কেন। কেন হাত দিতে গেলে আমার ব্যাগে? জান না, না-বলে অন্যের জিনিসে হাত দেওয়াকে কী বলে?'

মার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। রুদ্ধ গলায় বলেছেন, 'কী?'

'চুরি। চুরি। চুরি।' মুখের পেশি কঠিন, জিভটাকে ছুরির ফলার মত ধারালো করে বড়দি বলেছে।

'কী বললি, কী?' দেখেছি মার শরীরটা পা থেকে মাথা অবধি কেঁপে উঠেছে, দু-হাতে সমস্ত জোর জড়ো করে তিনি ব্যাগটা বড়দির গায়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন, বড়দির গায়ে লাগেনি, কিন্তু ব্যাগটার মুখ বন্ধ ছিল না বলে ভিতরের সব জিনিস ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। খুচরো পয়সা, টুকরো কাগজ, নানা টুকিটাকি।

আর, আমরা, ছোটরা, বিছানা থেকে উঠে পড়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কুড়িয়ে তুলতে গেছি। রিনু একটা ফটো পেয়েছিল। ফস করে বউদি সেটা কেড়ে নিল, তুলে ধরল আলোতে-'তোমারই রবি।' মুচকি হেসে বলল, 'রবি কে ঠাকুরঝি। কার ফটো?'

ভয়, বিদ্বেষ, তেজ—বড়দির চোখে সব এক সঙ্গে জ্বলে উঠতে দেখেছি। হিংস্রভাবে সে এগিয়ে গেছে বউদির দিকে, বলেছে, 'দাও, দাও, ও-ছবি দাও।'

'দিচ্ছি। দেব। তোমার জিনিস আমি কি আর রাখব ঠাকুরঝি। কিন্তু বললে না ত কে?'

বড়দি বলেছে, 'আমার বন্ধু।'

একটা চোখ অতিশয় ছোট, চাউনি অতিশয় অর্থময় করে বউদি নিতান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলেছে, 'বুঝেছি। এই জন্যেই কি মা তোমার ব্যাগে হাত দিতে না দিতে অমন ক্ষেপে গিয়েছিলে ঠাকুরঝি?'

সাহস পেয়ে ছোড়দিও এগিয়ে এসেছে। দু'টো সিনেমার টিকিটের টুকরো বড়দির চোখের সামনে মেলে ধরে বলেছে, 'আর এই বন্ধুটির সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিলে বলেই বিকেলের গাড়িতে বুঝি আসতে পারনি?'

হ্যারিকেনটার শিখা দপ-দপ করে কাঁপছিল। ভয় হয়েছিল, চিমনিটা ফট করে ফেটে ঘরটা বুঝি কালো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে।

মা হঠাৎ, বলে উঠেছেন, 'ছি, মায়া, ছি! তুই এতটা নেমে গেছিস?'

মনে আছে চকচকে অপলক কালো চোখ—বড়দি ফটো তোলার মত সুন্দর ভঙ্গি করে দাঁড়াল, উদ্ধত উন্নত উদ্যত।—'নেমে গেছি? কী করে এসব যে তোমাদের মাথায় আসে মা। জানলেই যদি, তবে সবটাই জেনে রাখ। রবিকে আমি বিয়ে করব!'

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে কনকনে হিম বরফ-ঝরান হাওয়ায় যেন ঘরটা ছেয়ে গেছে। সহসা সকলে চুপ করে গেছে। ককিয়ে উঠেছে বউদির কোলের বাচ্চাটা, দমকে দমকে কেশে নীল হয়ে গেছে। সে থামলে মা-ই প্রথম কথা বলেছেন, 'বিয়ে করবি?'

'করব। আমি নিজে থেকে পরে বলতাম, কিন্তু তোমরা জোর করে আজই জেনে নিলে। হ্যাঁ করব, আসছে মাসেই।'

'আসছে মাসে যে ছায়ার বিয়ে পাকা করেছি। তুই ত গরজ দেখিয়েছিলি, খরচপত্র জোগাড় করবি বলেছিলি—'

'পারব না। আমরাও বাসা করব। অনেক খরচ আছে।'

পিছন থেকে হিস-হিস করে কে বলে উঠেছে, 'স্বার্থপর, স্বার্থপর কোথাকার।' চেয়ে দেখেছি, ছোড়দি। ঘৃণা আর হতাশা দু-চোখে পূরে নিয়ে বড়দির দিকে চেয়ে আছে।

এবারে মা মরীয়ার মত হয়ে বলে উঠেছেন, 'খোঁড়া বোনটা তবে আইবুড়ো হয়ে থাকবে?'

'দায়িত্ব ত আমার একার নয়।'

মা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলেছেন, 'কলকাতায় আলাদা বাসা করবি বলছিস, আর আমরা এখানেই পড়ে থাকব, এই ভাঙা বাড়িতে, ঝড়-জলে কষ্ট পেয়ে।'

বড়দি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছে, উত্তর দেয়নি।

হঠাৎ তীব্র, ঝাঁঝালো গলায় মা বলে উঠেছেন, 'এত লোভ তোর! তবে যে বলতিস তুই যোগিনী, সন্ন্যাসিনী, সে কি শুধু লোকের কাছে দাম বাড়াতে?'

তিক্ত-স্বরে বড়দি বলেছে, 'মিথ্যে কথা বলো না। ও-সব বড়াই আমি কখনও করিনি। খোঁড়া বলে এক মেয়ের বিয়ে হয় না, ছেলে বেকার, বিয়ে করেছে কিন্তু ঘরে এক পয়সা আনে না, তাই তোমরাই সকলে মিলে আমাকে সন্ন্যাসিনী সাজিয়েছিলে। মনে নেই? তা, অনেক দিন ত হল মা, বয়স আমার এখন বত্রিশ, সন্ন্যাসিনীর পার্টে প্লে-ও মন্দ করলুম না। এবারে ছুটি দাও?'

দাদা এতক্ষণ কিছু বলেনি, কিছু বলার সুযোগ না পেয়েই বুঝি মাঝে মাঝে হাঁক দিয়ে উঠেছে, 'ছোটরা সব সয়ে যাও, শুয়ে পড় যে যার জায়গায়, বাকী সময়টা ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকেছে। সে এইবার বোকার মত বলে উঠল, 'ঠিক বলেছিস মায়া, আমাকে রোজগার করতে হবে। একটা কোম্পানী খুলব ঠিক করেছি। তুই আমাকে কিছু টাকা দিবি মায়া, শেয়ার কিনবি? তোকে—ডিরেক্টর করে দেব।'

ন্যালা-ভোলা মানুষ, পাগলের মত আরও কত কী বলে যেত ঠিক নেই, কিন্তু বৌদি বলতে দেয়নি, দাদাকে টেনে পিছনে নিয়ে গেছে। কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে বলেছে, 'ছেলে-বউ খাওয়াতে পার না বলে সব সময় খোঁটা শোন, লজ্জা করে না তোমার?'

দাদা তবু বোকার মত হাসছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বউদি বলেছে, 'অক্ষম অপদার্থ। মর, মর তুমি।'

আশ্চর্য, এতক্ষণে দাদার পৌরুষে লেগেছে, মুঠি পাকিয়ে এগিয়ে গেছে, আতঙ্কিত চোখ দিয়ে আমরা সব দেখেছি, অস্থির হয়ে এর কাছ থেকে ওর কাছে ছুটে গেছি, চোখ দিয়েই বলতে চেয়েছি, 'বউদি, চুপ কর পায়ে পড়ি। দাদা, দাদা, থাম।' ভীত বউদি পালাতে গিয়ে বড়দির গায়েই পড়েছে, বড়দির কপালটা ফুলে হয়েছে সুপুরি, আর বউদির রোগা বাচ্চাটা কান্না আর কাশি মিশিয়ে অবিরল ঘর্ঘর গলায় একটানা কেঁদে গেছে।

শেষ বারের মত দপ-দপ করে হ্যারিকেনটা ঠিক তখনই নিবেছে।

সেই রুদ্ধশ্বাস আর বিশ্রী আর কালিঢালা রাত্রে আমরা বালিশে মুখ লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। বড়দি আলাদা বাসা করবে, পর হয়ে যাবে, সেই দুঃখে। এতকালের এত আপন কয়েকটি মানুষ হঠাৎ কুৎসিত ঝগড়া করে একেবারে পর হয়ে গেল, সেই লজ্জায়।

আসলে তখন বয়স কম ছিল, মূঢ়, অব্যক্ত যন্ত্রণায় কষ্ট পেতাম, কিন্তু কিছু বুঝতাম না। বুঝলে টের পেতাম, কিছুই পর হয়নি, আপন যারা, তারা আপনই আছে। নিজেদের ভালও বাসে। আর নিখাদ ভালবাসা কাঁচা লোহার মত ঠুনকো; ঘৃণা দ্বেষ এই সবের মিশাল দিলে তবে সেই ভালবাসা ইস্পাতের মত মজবুত আর কঠিন হয়।

আরও একটা কথা সেদিন ভেবে দেখিনি। রাতটা অসহ্য লাগছে, কিন্তু রাতের পরে ত সকাল আছে। সকালের আলোয় অনেক কিছু চোখে পড়ত বড়দির, যা আগের দিন আধো-অন্ধকারে ভাল করে দেখা হয়নি। তখন নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেত।

দেখত, ছাদ আর দেয়ালের ফাটলে বৃষ্টির জলের শুকনো দানা, বউদির বাচ্চাটার জিরজিরে বুকের হাড় ক'খানা সত্যিই গোনা যায়; একটা পা টেনে টেনে ছোড়দি হাঁটে; তার অসহায় করুণ রূপ ওর চোখকে বার বার পীড়া দিত। এই পরিবার থেকে পর হয়ে যাবার দুর্বল ইচ্ছাটা সঙ্গে সঙ্গে শিকড়সুদ্ধ উঠত নড়ে।

তারপর চুল আঁচড়াতে আয়নার সামনে দাঁড়ালে যখন একটি দু'টি পাকা চুল চিক চিক করে উঠত, তখন কুণ্ঠায় ভয়ে ওর হাত থেকে চিরুনিটাও কি খসে পড়ত না! শেষবারের মত বড়দি ভাবত, সব সাধ-আহ্লাদ কৌটোয় পূরে একদিন ত কুয়োতেই ফেলে দিয়েছিল, কৌটোটা জলের তলেই থাকুক, তাকে আর তুলে এনে কাজ নেই।

ঈশ্বরের মৃত্যু

[এত চরিত্র থাকতে গড়পাহাড়ের মনসিজ রায়কে কেন বেছে নিলুম সে কৈফিয়ত নিজেকেই দিতে পারিনি। চরিত্রটি অসামান্য, কিন্তু আমি তাঁকে সামান্যই চিনি। একবার কিছুক্ষণের জন্য কাছে দেখেছি মাত্র। তখন তিনি কীর্তির চূড়ায়, বহুর মুখে তাঁর জয়ধ্বনি। সেই গোলে তখন হরিবোল দিতে পারিনি। মনে হয়েছিল কোথাও ফাঁকি আছে। সরে এসেছি। আজ সেই নাম ধূলিলীন। তাতেও স্বস্তি পাই না, সুখ তো নয়ই। বারবার ভাবছি, নিশ্চয় কোথাও ভুল ঘটছে; কূলকিনারা না পেয়ে অবশেষে এই গল্প]

[১]

প্রথমবার যখন গড়পাহাড়ের মাটিতে পা দিই তখন সন্ধ্যা, দিকচোখে নেশার রক্তিম ঘোর। এবার গিয়েছিলুম সকালে। প্রথমবারের কথা আগে বলি।

তখন আষাঢ়ের শেষ, অসমতল মাটির বুক চুঁইয়ে গেরুয়াপৈতে ছোটবড় ধারা। দূরে-কাছে এই-চুপ-এই-চঞ্চল মেঘ, হালকা-রেঁায়া, ধোঁয়াধোঁয়া, নভঘুরে। থেকে থেকে হাওয়ার তুহিন তীর। চক্রবালরেখা কঠিন অয়োবলয়ের মতো।

খুব পুরনো কথা নয়, তবু মনে হয়, কতকাল কেটে গেছে। স্মৃতি-ফলকের লেখা ফিকে। যেন জন্মান্তর।

ইঞ্জিনের পরের কামরায় উঠেছিলুম। রৌদ্রের মুগাচাদরে কয়লার কালির ছিটে লাগছে। জানালায় কান পাতলে একটি আগ্নেয় কলিজার ধসধস শোনা যায়। তাকিয়ে দেখেছি সব কিছু যেন ভয়-পাওয়া, পিছন-ছুট, শুধু আমাদের মূঢ় একরোখা রেল-গাড়িটার গতি সামনের দিকে। অনেক দূরে, ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত পাহাড়ের একটি ঝাপসা চূড়া, একমাত্র সে-ই অচঞ্চল।

কতদিন পাহাড় দেখিনি! অজানার দিকে যাত্রাজনিত ভুরুভুরু ভয়, তবু মন খুশিতে একবার নেচে উঠেছিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সব

যেন বদলে গেল। চেয়ে দেখি, আগেকার ইস্‌টিশনে সহযাত্রীরা প্রায় সবাই নেমে গেছে, বাকী পথটুকু অন্তত এই কামরাটাতে আমি একা। এখান থেকে ঘন বনের এলাকা। রৌদ্রের মুগা চাদর কে যেন ত্রস্তে গুটিয়ে নিয়েছে। একচক্ষু হরিণের মত দিশাহারা ইঞ্জিন অরণ্যগর্ভে পথ খুঁজে মরে।

খানিকক্ষণের জন্যে চোখ বুঁজে থাকব। একবার তাকিয়ে দেখি বনের সীমা কখন শেষ হয়ে গেছে, তেপান্তরের মাঠে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আমাদের গাড়ি। বেলাশেষের আলোয় শীর্ণলেখা ত্রিপূর্ণি চোখে পড়ল। এই রেলপথের ওখানেই শেষ। তারপর খেয়াঘাট, নদী পাড়ি দিয়ে যেতে হবে ওপারে, যেখানে সুব্রত, এখানে আমার চেনা একমাত্র মানুষটি, অপেক্ষা করবে বলেছে।

পাথরকুচি-ছাওয়া প্লাটফরম, টিপটিপ বর্ষা মাথায় নিয়ে নামতেই হু হু হাওয়া একবার আমার পা থেকে চুলের ডগা অবধি কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। সামনে ইঞ্জিনের পথ জুড়ে রক্তাক্ত নিষেধ : 'ডেড এণ্ড'। নদীর বনঝাউ-ঝাপসা অববাহিকার ঠিক পরেই বোবা-হাবশী পাহারাদার পাহাড়, একটার পিছনে আরেকটা স্থির অন্ধ, সারি-সারি। এদিক ওদিক ভাল করে চেয়ে দেখলুম, আমি ছাড়া দ্বিতীয় যাত্রী নেই। পশমের জামাপরা একটা লোক পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখে কথা নেই, চোখ অপলক, আমার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিল। টিকিটচেকার। পিজবোর্ডের টুকরোটা ওর হাতে গুঁজে দিয়ে ঘাটের দিকে এগিয়ে গেলুম।

সুব্রত ওপারেই ছিল। কদমছাট চুল, পরনে শার্ট, পরিচয় না দিলে তাকে হয়ত চিনতুমই না। ঘাট পিছল, একটু আগে এখানে বুঝি ঝড়ের ঝাড়ু পড়ে গেছে, সুব্রত হাত বাড়িয়ে আমাকে তুলে নিল। বললুম, এ কী চেহারা করেছ।

কেন, খারাপ কী।

বললুম, না খারাপ নয়, তবে আলাদা। আর্ট ইস্কুল থেকে

বেরিয়ে এসে লম্বালম্বা চুল রেখেছিলে, ঢিলেঢালা জামা, কোনটারই বোতাম নেই কিম্বা খোলা ; ধুতি মাটিতে লুটোতে—

সুব্রত বলল, আর ?

ভাল করে ওর দিকে আরেক নজর চেয়ে নিয়ে বললুম, আর বোধহয় এর চেয়ে কিছু রোগা ছিলে।

—অর্থাৎ আগের চেয়ে শরীরটা ঢের মজবুত হয়েছে, এটাই তোমার ভাল লাগছে না, কেমন ? শিশির, তুমি ঠিক এক রকম রয়ে গেছ, ঘুনধরা বোহেমিয়ানার খাঁচায় মনময়নাকে এখনও ছোলাছাতু দিচ্ছ। এটা বোঝনা, একমাত্র সবল শরীরই সবল মনের আধার হতে পারে ? আগে ভাল করে খেতুম না, চলতে গেলে সামনের দিকে নুয়ে পড়তুম, মিনিট কুড়ি কাজের পরেই বসে বসে হাঁপাতে হত, থেকে থেকে যক্ষ্মারোগীর মত কাশতুম, সেই বুঝি ভাল ছিল ? এখন একটানা ছ'সাত ঘণ্টা কাজের পর শুধু এক পেয়ালা গরম দুধ খেয়ে নি। আবার কাজে লাগি।

ওর কব্জি থেকে কনুই আর জানু থেকে জুতো অবধি রোমশ শরীরটা একেবারে খালি, জলের ছাঁটে হাওয়ার ছুঁচে ভ্রুক্ষেপ নেই, সেদিকে একবার চাইতে গায়ে যেন কাঁটা দিল, কোথাও যেন শিল্পীটিকে পেলাম না, না ওর পোশাকে, না ভাববিহ্বল চোখে। কিম্বা, কে জানে, হয়ত আমারই সংস্কারগ্রস্ত মনের ভ্রম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

বাস চলতে শুরু করেছিল। দু'ধারের মাঠ হলদে রঙের কী এক ফসলে ভরে গেছে। শিষে শিষে ফড়িং, তাদের রঙও বুঝি হলদে, মাঝে মাঝে ফড়ফড় করে যখন ওড়ে তখনই শুধু আলাদা করে চেনা যায়।

একবার জিজ্ঞাসা করলুম, সেই কবে এসেছ, তখন থেকে এখানেই পড়ে আছ। তোমার ছবি আঁকা আজও শেষ হল না সুব্রত ? একটা বড় অয়েল পেন্টিং করবার ফরমাশ নিয়েই তো এসেছিলে না ? সেটা শেষ হয়নি ?

—কবে শেষ হয়েছে, কিন্তু নতুন ধরেছি যে।

—নতুন ছবি ?

—হাঁ, ওঁরই আলাদা আলাদা স্টাডি।

একবার বিস্ময় প্রকাশ না করে পারিনি। সেই থেকে এক ছবি আঁকছ, প্রৌঢ় খামখেয়ালী একটা মানুষের ? সুব্রত, এখানে বেশি দিন থাকলে তুমি মরে যাবে কিম্বা পাগল হবে। তুমি আমার সঙ্গে ফিরে চল।

সুব্রত নির্লিপ্ত একটা মুখভঙ্গি করে বাইরের দিকে তাকাল। অর্থাৎ উত্তর দেবারও প্রয়োজন নেই। আমার প্রস্তাব এমন হাস্যকর। অনেক পরে নিজে থেকেই ভিতরের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, মনসিজ রায়কে তুমি দেখনি তাই বলছ। শিশির এমন একটা সবজেক্ট পেলে তাকে আঁকার জন্যে যে কোন আর্টিস্ট একটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। চিবুক আর চোয়ালের এমন গড়ন তুমি দেখনি। আর নাক। তার বাইরেব ছাঁচটা কোনমতে হয়ত তুলে নিতে পারি, কিন্তু রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিজলীর যে স্ফুরণ, আমার তুলির সাধ্য কী তাকে যথাযথ আঁকে। ঘনরোম ভ্রূ, প্রশস্ত, প্রসন্ন ললাট—

—দিনরাত ওই রূপ ধ্যান করছ, বুঝি ?

হয়ত আমার ভঙ্গিতে একটু ব্যঙ্গ লেগে থাকবে, সুব্রত আহত চোখে তাকাল। এখানে এভাবে কথা বলছ শিশির, পাহাড়গড়ে গিয়ে কিন্তু চপলতা দেখিও না।

—কেন, তোমাদের ইস্কাবনের রাজাকে ভয়ের কিছু আছে নাকি।

সুব্রত এবার যেন রাগ করল, আরও একটু তফাতে সরে বসে বলল, জানিনে। শুধু ভয় আর ভরসা যাদের ব্যবহারিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রাণিবিজ্ঞানে তাদের স্থান কি উঁচুতে শিশির ? ভয় বা ভরসার কথা নয়। দেখব মানুষটি কেমন। যদি দেখি বড়, অন্তত আমাদের অনেকের চেয়ে উপরে, তবে তাঁর কাছে মাথা নোয়ানোর সংবুদ্ধি যেন থাকে।

আমার পরিহাস করার প্রবৃত্তি নিমেষে উবে গিয়েছিল। জানালার বাইরে চেয়ে চেয়ে ভেবেছি আরও কতদূরে আছে গড়-পাহাড়। ঝাঁকুনির তীব্রতা ক্রমেই বাড়ছে। মাটি এখানে বন্ধুর, কতকটা কুমোরের টালখাওয়া চাকের মত। দু'য়েকবার কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ার দশা হল, সুব্রতই ধরে ফেলে আমাকে বাঁচালে। হয়ত অপটুতা দিয়ে ওর সহানুভূতিও আকর্ষণ করে থাকব, কেননা ঈষৎ পরেই ওকে কোমল গলায় বলতে শুনলাম, আর বেশি নয়, ওই দেখ।

ওর আঙুলের নির্দেশ অনুসরণ করে দেখলুম, এখনও কিছু দূরে সবচেয়ে উঁচু টিলাটির উপরে সুডৌল একটি শ্বেত ঘট। ঘট নয়, গড়! কিন্তু কাছে যাবার আগে বুঝিনি। ওখানে এই বাস উঠবে? সুব্রত বলেছিল, না, ও পথটা এখনও তৈরী হয়নি। আগে তো এই রাস্তাটুকুও ছিল না। ত্রিপূর্ণির ঘাট থেকে পঁচিশ মাইল পাকা রাস্তা তৈরি করিয়েছেন পাহাড়গড়ের মালিক মনসিজ রায়। বাস সার্ভিসও চালু করেছেন তিনি।

ঘটটি স্ফীত হতে হতে একটি প্রাকারের রূপ নিল, আমরা যখন টিলাটার নীচে গিয়ে পৌঁছলাম তখন সূর্য একেবারে ডুবে গেছে।

সুব্রত আমাকে হুঁশিয়ার না করে দিলেও পারত। গড়পাহাড়ের দেউড়ি পেরোলে পা অসাড় এবং জিহ্বা আপনা থেকেই জড় হয়ে যায়। কোন প্রকার চপলতা সেখানে অসম্ভব। ঠাণ্ডা পাথরে বাঁধানো মেঝে, শ্রেণীবদ্ধ প্রহরীর মতো দীর্ঘ থামগুলি শুধু মূক নয় পঙ্গুও, একঠায় দাঁড়িয়ে দীর্ঘতর ছায়ার ফিতে ফেলে মেঝের পরিসর মাপে। একান্তে নিজের কাছে বলা অস্ফুট বাণীটিও দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে শতগুণ মুখর হয়ে নিজের কানে ফিরে আসে। এতটুকুও ধুলো কোথাও নেই, একটি ভাঙা ডালের কুটো কি ঝরাপাতা নেই আনাচে কানাচে, অনাবশ্যক সব কিছু নির্মম ভাবে ছাঁটাই হয়ে গেছে, সর্বত্র কর্মপটুতার নির্ভুল ছাপ।

দু'পাশের ঘরগুলির প্রত্যেকটিই যথেষ্ট আলোকিত, অন্তত যেতে যেতে তাই মনে হয়েছিল, হাওয়ার গতিবিধিও অবাধ। বারান্দাগুলি কয়েকটি দ্বিধাহীন সরল রেখার মতো মহলের পর মহল পার হয়ে গেছে।

এই পরিবেশের পক্ষে গড়পাহাড়ের পরিকল্পনা এবং বিন্যাস আশ্চর্য রকমের নতুন। অনুভব করেছিলাম এবং সুব্রতকে বলতেও দ্বিধা করিনি।

—সবটাই মনসিজ রায় ভেঙে নতুন করে গড়েছেন যে। আগে তো এরকম ছিল না। আজ থেকে কয়েক বছর আগেও গড়পাহাড়কে দেখাত সেকালের কাহিনীতে পড়া রহস্যময় যক্ষপুরীর মত। মেঝে তখনও পাথরে বাঁধানো ছিল, কিন্তু পিছল, দেয়াল ছিল ভিজে স্যাঁতসেঁতে, এই সাতমহলা ইমারতের কলিজার ফুসফুসে ছিল চাপচাপ ভয়, কত শতকের পোষা কালো-বিড়াল অন্ধকার, রকমারি ঝাড়লণ্ঠনের ছটায় বাহার যত, তত আলো ছিল না। সব কিছু আমূল সংস্কার করেছেন মনসিজ। এখনও সব কাজ শেষ হয়নি। দেখবে? এদিকে এস।

সুব্রত আমাকে টেনে নিয়ে গেল একদিকে, সেটা বোধহয় এই বিপুল প্রাসাদের পিছন দিক, ধ্বংসস্তূপে পরিকীর্ণ। এখানে ভাঙার কাজ শেষ হয়েছে, কিন্তু গড়া শুরু হয়নি। এই মহলটাতে আগে গানবাজনার জলসা বসত। মনসিজ বললেন, বাজে জিনিসের এখানে স্থান নেই। গোটা মহলটা একেবারে গুঁড়িয়ে দিলেন।

—আর গানবাজনা হবে না? বিমূঢ় আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। হবে বইকি, হবে। সংস্কারের এই বিরাট প্রয়াসটাই একটা সমবেত সঙ্গীত, মনসিজ বলেন।

—একজনের শেখানো সুরে। হঠাৎ চটুল গলায় বলে উঠলুম। কানু ছাড়া গীত নেই। মনসিজ ছাড়া এই বৃন্দাবনে কি পুরুষও নেই? আর সব মোহিত গোপিনী?

আরও কত কী বলতুম ঠিক নেই। হঠাৎ চেয়ে দেখি সুব্রতর মুখ পাংশু হয়ে গেছে।

কত দিন গেল, তবু আজও লিখতে বসে দেখছি বিরাট গড়পাহাড় মনের প্রাঙ্গণে তার দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়াল। চুপ করে কিছুক্ষণ শ্রাবণের আকাশের দিকে চেয়ে থাকলে তার থমথমে আবহাওয়ার কিছুটা যেন অনুভবে পাই ; কথার পর কথা সাজিয়ে তার স্তব্ধ গম্ভীর রূপের আভাসটুকুও আঁকা যায় না।

প্রথম মনে পড়ছে মৃণালিনীকে। আমাকে নিয়ে সুব্রত খাবার ঘরে গেল, উনি আলোর নীচে বসে কী একটা বুনছিলেন। নিঃশব্দে ঢুকে আসন নিয়েছিলুম, আমাদের দেখতে পাননি। কিন্তু প্রায় তখনই দেয়ালঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় কী ইশারা হল, একটি অশ্রুত গানে নিয়মিত তাল দেবার মত বাজতে লাগল, এক, দুই, তিন... আট অবধি। মৃণালিনী মাথা তুললেন, আমাদের দেখলেন, হয়ত ঈষৎ হাসলেন। সুব্রত আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে কী বলেছিল মনে নেই, মাথা সামান্য হেলিয়ে দু'জনই দু'জনকে নমস্কার করে থাকব। তারপরও দু' তিন মিনিট কেটে গেল, কোন কথা হয়নি, টেবিলের শুভ্রচ্ছদে সুব্রত আঙুল দিয়ে একটা ছবি এঁকে গেল, আমি হাত বাড়িয়ে একটি ফুল তুলে তার ঘ্রাণ নিলুম, মৃণালিনী কী করলেন মাথা তুলে দেখিনি। দেয়ালঘড়ির কাঁটা সরে গিয়ে আবার ঘষ করে যেন একটা সঙ্কেত হল, আটটা পাঁচ। মৃণালিনী উঠে দাঁড়ালেন, সুব্রতর সঙ্গে চোখেচোখে দুর্বোধ্য ভাষায় কী কথা হল, ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে ওঁকে বেরিয়ে যেতে দেখলুম। সামনা-সামনি ভালো করে দেখতে ভরসা হয়নি, পিছন থেকে, যতক্ষণ না একেবারে মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ ওঁর দেহভঙ্গি দেখলুম। না, মদালস কুঞ্জর নয়, চকিত হরিণী নয়, না-ধীর-না-দ্রুত সেই গতির কোন ধ্রুপদী তুলনা নেই। একটা বিজলীজ্বালার শীর্ণ দীর্ঘ সরলরেখা বলতে পারি, কিন্তু তাও ঠিক হবে না।

—ওঁর কোনদিন দেরি হয় না। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আসেন।

সুব্রতর কথায় চমক ভাঙল। বললুম কে ?

—মনসিজ রায়।

ওঁকে ডাকতেই মৃণালিনী উঠে গেছেন, বুঝতে পারলুম।

ঠিক তিন মিনিটের মাথায় মৃণালিনী ফিরে এলেন। পরিবেশক ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল, তাকে খাবার আনতে বললেন।—উনি আসবেন না ? সুব্রত জিজ্ঞাসা করে থাকবে।

—না। শরীর ভাল নেই বললেন।

—ডাক্তারকে কি—

—বললেন, তেমন কিছু নয়, দরকার হবে না।

খাবার টেবিলে সেদিন কথা যা, তা ওইটুকু। আমার সঙ্গে মৃণালিনীর সোজাসুজি বাক্যালাপ হয়নি। তবু মুখে গ্রাস তোলার ফাঁকে ফাঁকে আড়াচোখে চেয়ে দেখেছি, তিনিও আমাকে লক্ষ্য করছেন। স্থির-পল্লব দৃষ্টি, মনে হয়েছে বড় বেশি শীতল, বড় অপলক। ঘোমটা নেই, সিঁথিতে রঙ নেই, শাড়িটাতেও যৎসামান্য; সরু একগাছি করে চুড়ি বাদ দিলে ফর্সা রোগা হাত দু'টিও খালি। মৃণালিনীর বয়স কত অনুমান করতে পারিনি। দেহতটে কবে একদিন যৌবন আছড়ে পড়েছিল তার দু' একটি ঢেউ সুশালীন বেশবাসের ভাঁজে ভাঁজে আজও ধরা পড়ে আছে, যাব যাব করেও একেবারে মিলিয়ে যায়নি ; আধখোলা একটি কঠিন ঝিনুক ওষ্ঠপুটে বেঁকে আছে।

খাওয়াশেষে মুখ ধুতে ধুতে সুব্রতকে ফিসফিস করে বলেছিলাম, এঁকে তো—

—বারে, পরিচয় করিয়ে দিলাম যে, তখন খেয়াল করে শোননি ? ইনি মনসিজ রায়ের ভাগনী। কিন্তু এ পরিচয় শুধু লৌকিক। এখানকার মেয়েদের একটা কল্যাণসঙ্ঘ উনিই গড়ে তুলেছেন।

তবু জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আর?

—বিয়ে হয়েছে কিনা জানতে চাইছ? হয়নি, শুধু এইটুকু জেনে রাখ। প্রশ্ন করোনা, কেন। উত্তর দিতে পারব না।

মনসিজ রায়ের সঙ্গে সেদিন রাত্রে দেখা হয়নি, তবু তাঁকে আমি দেখেছিলাম। দূরে থেকে। সেই ঘটনাটুকু বলে প্রথম দিনের বিবরণ শেষ করি।

সুব্রতর সঙ্গে এক ঘরেই আমার বিছানা হয়েছিল। শিয়রে কাঁচের পাত্রে রাখা ঠাণ্ডা জল, উপরে মৃদু ঘূর্ণিত বিজলী পাখা, এক কোণে টোপর-পরা টেবিল ল্যাম্প। আরামের উপকরণ সবই ছিল। তবু সহজে ঘুম আসেনি। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে টেবিল আলোটাকে কানা করে দিলাম, কালো-পশম অন্ধকারের নরম রোঁয়া শরীর আর চেতনা জড়িয়ে ধরল, তখনও ঘুম এল না। জানালার বাইরে চেয়ে দেখেছি, নতনিবিড় মেঘের ঘেরাটোপে ধরা পড়ে ক্ষয়ক্ষীণ চাঁদ ছটফট একটা মৌমাছির মত কেবলই এদিক ওদিক পথ খুঁজছে। কয়েক ফোঁটা ঝিরঝির বৃষ্টি এরই মধ্যে হয়ে গেল। কনকনে ভিজে হাওয়া ঠেকাতে গলা অবধি একটা চাদরে ঢেকে নিলুম।

আর ঠিক তখনই হাড়কাঁপানো গলায় একটা কুকুরের তীব্র চিৎকার কানে এল।

পাশের বিছানা থেকে মুখ বাড়িয়ে সুব্রতকে বলতে শুনলাম, উনি ছাদে এসেছেন। কুকুরটা ওঁকে দেখতে না পেয়ে কাঁদছে।

—পোষা কুকুর?

—হ্যাঁ, একেবারে বাঘা জাতের। ওঁর দিনরাতের সঙ্গী।

উঠে গিয়ে জানালায় চোখ রাখলুম। আমরা যেখানে আছি সেটাই সবচেয়ে উঁচু তলা, তবু এর উপরেও একটু আছে। দূর থেকে মনে হয় গম্বুজ, আসলে কিন্তু ওটাও একটা ঘর, ওখানে মনসিজ রায় থাকেন। ঘোরানো, রুদ্ধশ্বাস, ঢাকা সিঁড়ি পেরিয়ে পৌঁছতে হয়।

ঘরের সামনে বাঁধানো একটু খোলা জায়গা, ওটাই ছাত, সেখানে আবছা আলোতে একটি ছায়ামূর্তিকে বুকের উপর আড়াআড়ি ভাবে হাত রেখে পায়চারি করতে দেখেছি। বলে দিতে হয়নি। দেখেই চিনেছি, ইনিই মনসিজ রায়। গড়পাহাড়ে ঢুকতেই অতিকায় দৈত্যবৎ একটি ব্রোঞ্জমূর্তি চোখে পড়েছিল। দৈর্ঘ্যে সেটা আশেপাশের সব কিছু ছাড়িয়ে গেছে। তারপর এই প্রাসাদের ঘরে ঘরে, অলিন্দে, এঁর নানা আকারের প্রতিকৃতি দেখেছি। আর কেউ নয়, আর কারুর নয়, সব মনসিজ রায়ের। বিপুল ব্যক্তিত্বের পক্ষপুট মেলে গরুড়ের গড়পাহারকে ঢেকে আছেন।

এত ছবি, শুধু একটা মানুষের। আশ্চর্য নয়, সুব্রত সেই কবে থেকে একই ছবি আঁকছে, আজও শেষ হল না। একই মুখ, নানা বেশে, নানা পরিবেশে। সেই ভ্রূভঙ্গি, কঠিন মুখপেশী ঃ দৃপ্ত, অটল, প্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল।

সুব্রত পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শুনেছিলাম ওঁর অসুখ--

—বোধ হয়, ঘুম হয়নি তাই উঠে এসেছেন। এমন সময় রোজ এমনিও একবার ওঠেন। একা ওই মিনারের পাশে দাঁড়ান। এখান থেকে যতটুকু দেখা যায় সব ওঁর স্বপ্ন আর স্বেদে তৈরি। চুপে চুপে দেখেন।

ছায়ামূর্তি তখনও ছাতের আলসেয় কনুইয়ে চিবুক রেখে দাঁড়িয়ে। ঠিক তখনই মূক অভিনয়ের দৃশ্যটুকু প্রত্যক্ষ করলুম। একটা নেকড়ের মত কুকুর কোথা থেকে এসে ছাতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার ছাইরঙ রোম অন্ধকারের ছায়াছায়া আঁশের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে, কিন্তু মসৃণ, নীরন্ধ্র নীরবতার পটে তার তপ্ত হাঁপরের মত লকলকে শ্বাস আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। দু'টি থাবা তুলে সে ছায়ামূর্তির জানু জড়িয়ে ধরল, একবার মনে হল বুঝি কটি ছাড়িয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে কণ্ঠাশ্লিষ্টও হবে, কিন্তু তার আগেই মনসিজ তাকে ধমক দিয়ে নামিয়ে দিয়েছেন।

—ভিতরে যাও এখুনি, যা-ও ?

সঙ্গে সঙ্গে সেই নেকড়ে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। পাথরের মেঝেয় নখে আঁচড় কেটে হয়ত প্রতিবাদ জানাল, পর মুহূর্তেই তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলুম।

সুব্রতও দেখছিল। আমার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, ওই একটি জীব, ওঁকে প্রাণ দিয়ে ও আগলে আছে, কতবার বাঁচিয়েছে হিসাব নেই। একবার তো ক'জন ওঁর শোবার ঘরে ছোরা হাতে—

—ছোরা হাতে ? সবিস্ময়ে বলেছিলাম, ওঁরও তবে শত্রু—

—আছে বইকি। এত বড় মানুষ, এত করেছেন এখানকার সবায়ের জন্যে, ওঁর শত্রু থাকবে না ? কতবার তো ওঁর খাবারে বিষ মেশানোর চেষ্টা ধরা পড়ে গেছে।

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু কুকুরটার কথা কী বলছিলে ?

—ও হাঁ, টাইগার। ওকেও খুব ভালবাসেন মনসিজ। বোধ হয় আর কেউ নেই যে ওঁর এত কাছে নিঃসঙ্কোচে যায়, যেতে পারে, কোলে উঠতে পারে। ওঁর বাঁ গালে একটা দাগ আছে, দেখো। সেটা বাঘারই নখের আঁচড়। এই একটি জীবের সঙ্গে ওঁর সত্যিকার সখ্য। যাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

—কেন, ওঁর ভাগিনী ?

ভাগনী ? ও, মৃণালিনীর কথা বলছ। আপন ভাগনী তো নয়। না, ওঁর এত কাছে যাবার অধিকার মৃণালিনীরও নেই।

শুধু দূর থেকে নয়, মনসিজ রায়কে কাছে থেকেও দেখেছি। সুব্রত পরদিন সকালে আমার নাম করে চিরকুট পাঠিয়ে দিয়েছিল। ঠিক ন'টার সময় উর্দিপরা বেহারা সেলাম করে দাঁড়াল। মনসিজ স্মরণ করেছেন।

সেই ঘোরানো সিঁড়ি আর ফুরোয়না। ধাপ গুনে গুনে উঠতে শুরু করেছিলাম, কপালে এক ফোঁটা দু' ফোঁটা করে ঘাম জমল,

মুছে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দেখি খেই হারিয়ে গেছে। উপর দিকে চাইলাম তখনও অনেক ধাপ বাকী।

মানুষের কল্যাণ চান মনসিজ, কিন্তু মানুষকে তাঁর ভরসা নেই। তাই অনেক দূরে, অনেক উপরে, একেবারে যেন আকাশে নীড় বেঁধেছেন।

—আসুন, ইস্‌কাবনের রাজাকে দেখতে এসেছেন?

চমকে চেয়ে দেখি কখন পৌঁছে গেছি, মাঝখানে পিছল মসৃণ মেঝে, মাত্র কয়েক ফুট দূরে মনসিজ রায়। নমস্কার করতেও ভুলে গেছি। আমাকে দেখেই টাইগার অকারণ ঘেউ ঘেউ করে থাবা তুলে দাঁড়াল, চেনে বাঁধা, সুতরাং এগোতে পারল না, কড়াগলা ধমক খেয়ে মাটিতেই লুটিয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তেই দেয়ালে দেয়ালে থমথমে একটি কণ্ঠস্বর প্রতিহত হল: ইস্‌কাবনের রাজাকে দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না বুঝি?

হাতে কাগজকাটা একটা প্লাস্টিকের ছুরি, সেইটে নিয়ে মনসিজ আলতো হাতে খেলছেন, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কী করে আপনার দেওয়া নামটা আমার কানে এল ভেবে অবাক হয়েছেন? আমি সব যে জানতে পাই। যাই বলুন, নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে মনসিজ করমর্দন করলেন, মুখে তখনও সেই চতুর, একটু-বা দুর্বোধ্য হাসি, বুকের ছাতি তো নয় যেন কবাট, ঝাঁকুনি খেয়ে টের পেলাম কী অসীম শক্তি পাঁচ আঙুলের মুঠিতে, আবার এও টের পেলাম সেই আঙুলের ডগা যেন থরথর করে কাঁপছেও। বেশিক্ষণ চোখে চোখে চাইতে পারিনি, তীব্র, মর্মদর্শী দৃষ্টি, তবুও এক নিমেষেই বুঝেছিলাম, সে চোখেরও পলক পড়ে।

—আপনি সুব্রতর বন্ধু, দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। কাগজকাটা ছুরিটা দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে দিতে মনসিজ বললেন, আপনার কথা আমি শুনেছি। আরও শুনেছি,—সহসা মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রেখে মনসিজ বলে গেলেন,—আপনি ঐতিহাসিক।

তথ্য সংগ্রহের জন্যে বেরিয়েছেন। আপনার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতিটা কী।

উত্তরের আশায় আমার চোখে চোখ রেখেই মনসিজ চুপ করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব আমার মুখে জোগাল না। খানিক পরে আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করলুম, পদ্ধতি, পদ্ধতি আবার কী। পড়া। দেখা। সত্যই তথ্য।

—সত্যই তথ্য? আমার মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে মনসিজ তীব্র গলায় হেসে উঠেছিলেন মনে আছে।—এ-সব গালভরা কথা বলে সরলমতি ছাত্রদের ভোলাবেন।—সত্যের উপরেও আরেকটা কথা আছে, হিত। দৃষ্টবস্তুকেই আপনি সত্যজ্ঞান করেন, ধরে নিয়েছি। এ-নিয়ে তর্ক করব না। কিন্তু তা হলেও উদ্দেশ্য উপায় ইত্যাদি বহু গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা বাকী থেকে যায়। যা হয়, যা হয়েছে, তা আমরা সবাই জানি, মানুষের বাঁচামরার সমস্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ, শুধু সেই তথ্য দিয়ে পুঁথির পাতা বোঝাই করে কোন লাভ নেই। কী হওয়া উচিত, আমার কাছে এই কথাটা অনেক বেশি মূল্যবান। আমার সারাজীবন এই নিয়েই মাথা ঘামিয়েছি এবং আমার ধারণা, ঘটনার বিবরণী রচনার চেয়ে মানুষের অনেক বেশি কাজে লেগেছি।

সত্যি বলতে কি, মনসিজ কী বোঝাতে চান আমি ভাল বুঝতে পারছিলুম না। কাগজ কাটা প্লাস্টিকের ছুরিটা শক্ত মুঠোয় ধরা, চোখ দুটি কী এক আবেগে জ্বলছে, একবার মনে হয়েছিল মনসিজ প্রলাপ বকছেন। নইলে তাঁর কথার বিনীত জবাব দেওয়া আমার অসাধ্য ছিল না। বলতে পারতুম, ভাবী হিতের সঙ্গে অতীতের কথারও অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে। গতের বিফলতা আর সাফল্যের নুড়ি ঠুকে ঠুকেই মানুষ আগামীকালের পথের দিকে এগোয়।

সেই কঠিন চাউনি অবশ্য মনসিজের মুখ থেকে আপনা থেকেই মুছে গিয়েছিল, ফুটেছিল মৃদু মৃদু হাসি। হাসতে হাসতেই বলে-

ছিলেন, আপনারা জ্ঞানী, শুধু জানতে চান। আমি বৃথা কিছু জানি না, জানতে চাই না, আমি শুধু করি। কাজ করি। আমাদের তফাতটা কোথায় বুঝতে পেরেছেন।

কেবল কথা নয়, মনসিজ দেখিয়েও দিয়েছিলেন। ডেকে নিয়েছিলেন জানালার ধারে।

—আমার কাজের প্রমাণ চান? দেখুন। গরাদের বাইরে বলিষ্ঠ হাতের কব্জি অবধি বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন।

দেখেছিলাম। সবুজে সোনায় ছলছল খেত, যতদূর চোখ যায় ততদূর প্রসারিত ত্রিপূর্ণি নদী এখান থেকে ফিকে নীল ফিতের মতো।

—ওই নদীকে আমি বেঁধেছি। পরিপূর্ণ গলায় মনসিজকে বলতে শুনলুম।

আগে প্রতি বর্ষায় ত্রিপূর্ণি কূল ছাপিয়ে যেত। তার বানের টানে কত মোষ, গরু, মানুষ, হ্যাঁ মানুষও, ভেসে গেছে হিসাব নেই, জলধারার কুলকুল ধ্বনি ছাপিয়ে গৃহহারার কান্না টিলায় টিলায় প্রতিধ্বনিত হত। সেই অশ্রুনোনা নদী আজ চাষীর মুখে হাসি ফুটিয়েছে, ছোট ছোট নালা বয়ে এসেছে খেতের আল অবধি।

প্রথম যখন গড়পাহাড় আমার হাতে আসে তখন কী ছিল জানেন। পাহাড়ের ছায়ায় ছায়ায় উঁচু নীচু রুক্ষ পতিত জমি। পাথর, কাঁকর আর বালি। এক ছটাক দু' ছটাক জায়গা নিয়ে যারা চাষ করেছে তাদের জমিতে কোন স্বত্ব নেই। লাঙলের ফলায় ধার নেই। রুগ্ন পশুদের কাঁধের কাছে কী দগদগে ঘা, আপনি দেখেন নি। সেই ছোট ছোট জমির আল আমি ভেঙে দিয়ে সমান করেছি, এসেছে ট্রাক্টর।

বাধা আসেনি? এসেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বেড়াগুলিকে নির্মম হাতে গুঁড়িয়ে দিতে হয়েছে। মনসিজ হার মানেন নি। উপায়ের চেয়ে লক্ষ্যকে তিনি বরাবরই বড় বলে জানেন। জ্ঞাতিদের সরিয়ে দিতে হয়েছে। তারা একদল চাষীকে নিয়ে ঘোঁট পাকিয়ে

তুলতে চাইছিল। সেখানেই শেষ নয়। তারপর একদিন দুর্যোগের রাতে ত্রিপূর্ণির জলে বিরোধী দলের কুড়িজন চাষীকে—

—ডুবিয়ে মেরেছিলেন? অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠেছিলাম, মনে আছে।

নীরেখ মুখে শস্যহিল্লোলিত খেতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি তর্জনী ঘুরিয়ে মনসিজ বলেছিলেন, উপায় কী। কুড়িটি প্রাণের বিনিময়ে দু' হাজার প্রাণ কী আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছে দেখুন। সেই দুর্যোগের কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির দুর্ঘটনার কথা আজ কেউ মনেও রাখেনি।

বুক ভরে মনসিজ নিশ্বাস নিলেন, পরম প্রশান্তি দু' চোখ ছাপিয়ে ললাটে কপোলে ছড়িয়ে গেল, চিবুকের কঠিন ভঙ্গিটিকেও যেন নরম করে আনল।—এই সব নয়। আজ থেকে দশ বছর আগে এখানে এলে কী দেখতেন জানেন? পুরনো আমলের দুর্গের মত দেখতে একটা বাড়ি, তার আনাচে কানাচে আগাছা ছেয়ে গেছে, দেয়াল চিড় খেয়েছে অশ্বত্থশিকড়ের গুপ্তচৌর্যে। এর চেহারা আমূল বদলে দিয়েছি আমি। জ্ঞাতিরা এখানেও বাধা দিতে চেয়েছে। প্রথমে ঐতিহ্য, পরে বাজে খরচের ধুয়ো তুলেছে। কান দিইনি। সব ভেঙে নতুন করে গড়েছি। নড়বড়ে খিলান আর স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের নীচে অন্ধকার, টিকটিকি, চামচিকে, ইঁদুর, আরশোলা আর সাপের সঙ্গে অনেক মিথ্যা মোহ আর সংস্কার চিরকালের মত চাপা পড়ে গেছে। জ্ঞাতিরা সরে গেছে ক্ষতিপূরণ নিয়ে, দাবিদাওয়া ছেড়ে দিয়ে। নীচের তলায় ধ্বসধ্বস আওয়াজ শুনছেন, প্রকাণ্ড একটা হৃৎপিণ্ড চলার শব্দের মতন? ওটা নতুন গড়পাহাড়ের প্রাণ। ওখানে বিজলী ডায়নামো বসিয়েছি আমি। পুরনোর কবরে নতুন কালকে ডেকে এনেছি। আজ আমার কারখানায় তাঁত চলে, চাল ছাঁটাই হয়—একটা জীবনের পক্ষে যতটুকু সম্ভব সবই করেছি। দৃঢ়তা দিয়ে, কঠোর হয়ে, ইচ্ছা, শুধু প্রবল একটি ইচ্ছা দিয়ে অসাধ্যসাধন করেছি।

শ্রান্ত মনসিজ মুহূর্তের জন্যে চুপ করেছিলেন। কয়েকটা চড়ুই কোথা থেকে উড়ে এসে তাঁর ভুক্তাবশেষ রুটির টুকরো খুঁটে খুঁটে খেতে শুরু করেছিল। চেনবাঁধা বাঘা কুকুরটা গর্জন করে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, ধমক দিয়ে মনসিজ তাকে নিরস্ত করলেন।

—তবু অনেক বাকী থেকে গেছে। ইশারা করে মনসিজ আমাকে ডেকে আনলেন সামনের খোলা ছাতটিতে, প্রাঙ্গণের একটা ইটের পাঁচিলঘেরা জমি দেখিয়ে বললেন, ওই দেখুন আমার মঠ।

—আপনার মঠ ?

আমার। মনসিজের গাঢ় কণ্ঠ আপনা থেকেই নীচে নেমে এল—আমার অবর্তমানে কী হবে সে কথাও কিছু ভেবেছি বই কি। এ-মঠ শুধু লোকদেখানো একটা মিনার হবে না। এখানে বিজ্ঞানচর্চার ল্যাবরেটরি হবে। আমার একটা অপূর্ণ সাধ মৃত্যুর পরে পূর্ণ হবে।

আমার চোখে অবিশ্বাসের ছায়া মনসিজ দেখতে পেয়েছিলেন কিনা জানি না, হয়ত মনের কথা পড়ে নিয়ে বললেন, আপনি ভাবছেন আমার মৃত্যুর পর এ-সব কিছুই থাকবে না ? থাকবে, শিশিরবাবু, আমি বলছি, থাকবে। আপনি কি ভাবেন আমি এত বছর ধরে শুধু ইটের ওপর ইট আর পাথরের ওপর পাথরই সাজিয়ে গেছি। তা নয়, আমি মনের মত করে কয়েকটা মানুষও তৈরি করে গেছি যে। আমার স্বপ্ন, আমার কামনা সঞ্চারিত করে দিয়ে গেছি তাদের মনে।

—সেই মন যদি—

সম্পূর্ণ হতে দেননি, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনসিজ বলেছেন, সেই মন যদি বিকল হয় বলছেন ? যদি অন্য পথে চলে ? তা চলবে না। আমার পথেই চলবে, ভয়ে।

—ভয়ে ?

গভীর প্রত্যয়ে মনসিজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ভয়ে। কল্পিত ঈশ্বরকে মানুষ ভয় পায় না? পাপ-পুণ্যের ভয়ে এতবড় সমাজটার বাঁধুনি ঠিক থাকে দেখেন না? অদৃশ্য, অনির্দেশ্য ভয়ের শক্তি বড় বিচিত্র। আমার প্রতিকৃতি ছড়িয়ে দিয়েছি গড়পাহাড়ের ঘরে ঘরে। আপনার বন্ধু যা এঁকেছেন, আঁকছেন। সেই ছবিকে ওরা ভয় করে, পুজো করে। ওই ছবি আমার ইচ্ছার প্রতীক। আমার মৃত্যুর পর সেই ইচ্ছাই নিয়তির মত অমোঘ হয়ে অলঙ্ঘনীয় হয়ে ওদের ঠিক পথে চালাবে।

যুক্তি নয়, এটা বিশ্বাসের কথা, অতএব, প্রতিবাদ করিনি। নমস্কার করে চলে এসেছি। চেনবাঁধাগলা টাইগারকে নিয়ে মনসিজ আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিয়েছিলেন। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে নামতে সেদিন প্রভুভক্ত সন্দিগ্ধ কুকুরের অনুসারী ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনেছি।

সেদিনই বিকালে গড়পাহাড় ছেড়ে আসি, মনসিজের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। প্রাচীরের সীমা ছাড়িয়ে এসেও অনেক দূর থেকে অতিকায় একটি ব্রোঞ্জমূর্তি চোখে পড়েছে। বারবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছি। অতিমানব মনসিজের কঠোর ইচ্ছার প্রতীক।

আর দেখেছি মৃণালিনীকে। চলে আসার সময়ে তিনি বাইরে বারান্দায় রেলিঙে কনুই রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃশ, দীর্ঘাঙ্গী। মরা দিনের আলোয় কি তাঁর পীতাভ মুখে ঈষৎ রক্তচ্ছটা দেখেছি। কী জানি।

ত্রিপূর্ণির ঘাট অবধি সুব্রত আমাকে তুলে দিতে এসেছিল। বিদায়ের কিছু আগে বলেছিলাম, তুমিও চলে এস, সুব্রত। এই নদীর জল কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ঢেউয়ে ছোট ছোট ছায়া ফেলে কত পাখি ঘরে ফিরছে। একটু পরেই আধখানা চাঁদ বিগলিত অভ্রকণার মত ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছড়িয়ে পড়বে। কতদিন

তুমি এ-সব ছবি আঁকনি বলতো ? একটি দর্পী প্রৌঢ়ের রেখাকর্কশ মুখ সম্বল করে কত দিন একটি শিল্পীর কাটে !

সুব্রত উত্তর দেয়নি। প্রদোষের আলোয় নিষ্প্রভ মুখের দিকে চেয়ে আরেকটা কথা চকিতে মনে এসেছে। বলেছি, তবে কি ভুল করেছি, প্রৌঢ় মুখটি নয়, তুমি কি মৃণালিনীর মায়া কাটিয়ে আসতে পারছ না।

হঠাৎ সুব্রত আমার দু' হাত টেনে নিয়ে জোরে চাপ দিয়েছে।—তুমি জান না। মৃণালিনী কারুর নয়। কারুর জন্যে নয়। ঠিক ওর মামার ছাঁচে তৈরি। ওর গলা আর গালের হাড় কী উঁচু দেখনি ? আকৃতি বা প্রকৃতিতে দুর্বলতা নামক ধাতুটির ছিটেফোঁটাও কখনও লাগেনি।

—কাউকে কোন দিন ভালবাসেনি ?

—আমরা তো জানি না। একবার ঘটা করে খাঁচা এনে একটা টিয়ে পুষেছিল। দিনরাত তাকে নিয়ে থাকত, ছোলাছাতু খাওয়াত, বুলি শুনত। একদিন সকালে দেখা গেল, খাঁচার দরজা খোলা, ভিতরে জলের বাটি ওলটানো, টিয়েটা ঘাড় গুঁজে মরে পড়ে আছে।

—মরে পড়ে আছে ? অস্ফুট গলায় চেঁচিয়ে উঠেছি। সুব্রত, পাখিটাকে মনসিজ নিজে মারেননি তো ?

—জানি না। সুব্রত অন্য দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

কঠিন গলায় বললাম, সুব্রত, নিজের সঙ্গে প্রতারণা করো না। মৃণালিনীকে কোন দিন তোমার মনের কথা বলনি ?

অতি ধীরে, অপরাধ স্বীকার করার মত গলায় সুব্রত বলেছে, বলেছিলাম। রাগ করেনি, ওর মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। টিয়েটার মৃত্যুর দু' মাস পরের ঘটনা। গড়পাহাড় গড়ে তোলার মত কত কাজ, মৃদু গলায় বলেছে। পরে আমিও ভেবে দেখেছি, হয়ত ওর কথাই ঠিক। শিশির, সব মেয়ে হয়ত প্রসাধন, প্রসব আর শয্যার জন্যে নয়।

পুব আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সদ্যোজাত চাঁদের পিণ্ডটাকে কালো একখণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে। বিদ্রূপের সুরে বলেছি, এ-সবই মনসিজ রায়ের শেখানো বুলি, সুব্রত।

সুব্রত উত্তর দেয়নি। ততক্ষণ খেয়া ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে।

দুই

গড়পাহাড়ে আরও একবার গিয়েছিলাম। মনসিজ রায়ের মৃত্যুর পর।

মৃণালিনী তার করেছিল, সুব্রতর খুব অসুখ। আপনি আসুন।

মাঘের শেষ। ত্রিপূর্ণির ঘাটে খেয়ার দরকার নেই, পাথরের নুড়িতে পা রেখে রেখে অনায়াসে পার হওয়া গেল। সঙ্গে একটা ছোট এটাচিমাত্র। ওপারে গিয়ে দেখি চিকচিক রোদ, নরম, নয়নরম। গড়পাহাড়ের আকাশও তবে হাসে! প্রাসাদের শ্বেতঘট চূড়াটি যেন সোনার টোপর। গাছগুলো শুধু পত্রশ্রীহীন।

দেউড়ি পেরোতেই বিশাল ভীমকায় ব্রোঞ্জমূর্তি সেদিনের মতই স্পর্ধিত। পদপ্রান্তে দেখলাম টাইগার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে। শীতে ধুঁকছে। চেন বাঁধা নেই তবু তাড়া করে এলনা। আমার পায়ের সাড়ায় মাথা তুলল, বাতাসে কী যেন শুঁকল, ফের ঘাড় কাত করে ঘুমিয়ে পড়ল। পাশ কাটিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়ালাম।

দরজা খুলে যেতেই দেখলুম মৃণালিনী। পায়ে বোবা চটি, গায়ে পশমের চাদর। শাঁখার মত সাদা হাতের পাতা দু'টি বাইরে। হাসলেন। তাঁর সাদা দাঁতের পাঁতি পূর্বে দেখিনি, এবার দেখলুম। বললেন, আসুন।

তেমনি তকতকে মেঝে, কোথাও দাগটুকু লেগে নেই। হলঘরের সব ক'টি জানালাই খোলা। সকালের রোদ কাচের শার্সিতে ঠিকরে রামধনু রঙ নিয়েছে। সেই সঙ্গে কনকনে ভিজে হাওয়াও

চোখেমুখে লাগছিল, লাগুক। সেই ভয়-ভয় চাপা গুমোট তো নেই।

না, মনসিজের আশা মিথ্যে হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরও গড়-পাহাড় ধসে পড়েনি। সেই দক্ষতার ছাপ সর্বত্র। সবই নিয়মে চলেছে।

দেয়ালগুলো ফাঁকা ফাঁকা। কেমন যেন নিরাভরণ, নিরাবরণ, বড় বেশি সাদা। ওখানে কি সেবারে আর কিছু ছিল?

সুব্রতর ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে মৃণালিনী চলে গিয়েছিলেন। জানালা খোলা নেই, এ ঘরটা এখনও কেমন নিবু-নিবু অন্ধকার।

কবাট খোলার শব্দে সুব্রত মাথা তুলল। হেসে বলল, এস। এখানে বস। শিয়রের কাছে রাখা একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল।

বললাম, গড়পাহাড়ে আবার যে কখনও আসব, ভাবিনি। কিন্তু তোমার এ কী চেহারা হয়েছে সুব্রত। এই তো সেদিন দেখে গেলাম, বোধ হয় তিন বছরও হয়নি। সুস্থ, সবল দেখে-ছিলাম, এরই মধ্যে এত বুড়ো হয়ে পড়েছ?

বিরল, পাকধরা, কিন্তু দীর্ঘ চুলের ভিতর দিয়ে অলস আঙুল চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সুব্রত বলল বুড়ো? তা একটু হয়েছি বোধ হয়। বাইরে থেকে সব তো বোঝা যায় না, আমার ভিতরটা আরও বুড়িয়ে গেছে।

রোগে? ওর একখানা হাত টেনে নিলাম। রোগে যদি হয়, তোমাকে আমি এখান থেকে নিয়ে যাব, সারিয়ে তুলব। দেখবে আবার—

—দেখব মরা গাঙে বানের মত আবার আমার ভাঙা গাল ভরে উঠেছে, চোখের কোলের কালি ধুয়ে গেছে, না? কিন্তু আমার ভিতরের যৌবনও কি আবার ফিরে পাব। তা হয় না, বালিশে রেখেই ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সুব্রত। তা হয় না। —খুইয়েছি যা, তা আর ফিরে পাব না।

সঙ্গে সঙ্গে সুব্রতর আঁকা ছবির কথা মনে পড়ল, মনসিজ রায়ের নানা ভঙ্গির প্রতিকৃতি। এবার কোন দেয়ালে তার একটিও দেখিনি। সুব্রতকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। বিছানা থেকে মাথা একটুখানি তুলে সে বলেছিল, ছবি? আছে বৈকি। উপরে।

—উপরে?

—হাঁ, যে ঘরে মনসিজ থাকতেন সেটা এখন মিউজিয়ম হয়েছে জাননা? মনসিজ মিউজিয়ম।

—মিউজিয়ম? সেখানে কে যায়?

—যায় কেউ কেউ, যার ইচ্ছে হয়। চোখ বুঁজে বালিশে মাথা রেখে সুব্রত অবহেলার সুরে বলল, আমি তো যাই না।

'আমি তো যাই না,' সুব্রত আবার বলল, ধীরে ধীরে, প্রতিটি অক্ষর জিভ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। আমি যাই না। আমার সব মোহ ঘুচে গেছে। কিন্তু শিশির, বড় দেরিতে। জীবনের, যৌবনের অনেকগুলো বছর এখানে অপচয় করার পরে।

বলতে বলতে সুব্রত কেমন উত্তেজিত হল, হঠাৎ উঠে বসল, মাথার বালিশ দু'টো টেনে আনল কোলে। বিহ্বল রক্তিম দু'টি চোখ আমার দিকে রেখে বলল, তুমি জাননা, লোকটা খাঁটি ছিল না, জুয়াচোর, আমাদের সবাইকে ঠকিয়েছে।

বুঝতে পেরেও মূঢ়ের মতো প্রশ্ন করলুম, কে জুয়াচোর সুব্রত, কার কথা বলছ। মনসিজ?

—মনসিজ রায়। শ্রান্ত হয়ে সুব্রত আবার শুয়ে পড়েছে, চোখের পাতা দু'টি করতলে ঢেকে উচ্চারণ করল মনসিজ রায়। ওর মৃত্যুর পর ওর চিঠি বেরিয়ে পড়েছে, ওর স্বরূপ জানতে আজ কারও বাকী নেই। লোকটা একেবারে মুখোশ পরে ছিল। তুমি শুনে কিন্তু অবাক হবে, যাকে পরম আদর্শবাদী বলে, ত্যাগী বলে, নিপুণ সংগঠক বলে আমরা পুজো করতেও বাকী রাখিনি, সে বিকৃতমনা, পরস্বাপহারী বই কিছুই নয়? জ্ঞাতিদের ঠকিয়েছে, তাড়িয়েছে, এমন কি গুপ্তহত্যাতেও পেছপা হয়নি; যা কিছু করেছে শুধু

নিজের পুঁজি বাড়াবে বলে ? চাষীদের জমির স্বত্ব দিলুম বলে ঝড় জল রোদে পশুর মত খাটিয়েছে, অথচ আজ জানা গেছে সে সব দলিলের দাম আইনের চোখে কানাকড়িও নয়, আসল মালিকী স্বত্ব আছে ওর নিজের জিম্মায় ?

---আগে কেউ টের পায়নি ? কেউ জানত না।

---জানত দু' একজন, যারা পুরনো আমলের। কাউকে ঘুষে বশ করেছিল, অনেকেই তখন মুখ খুলতে পারেনি ভয়ে। আজ ওর কীর্তি জানতে কারুর বাকী নেই। মৃণালিনীও জানে। চোখ দু'টি আবার খুলেছে সুব্রত, মণি থেকে শুকনো আবীরের মতো রোষ ঝরছে, বলেছে, মৃণালিনীও জানে। এতটা যদি শুনলে, তবে শেষ ভয়ঙ্কর কথাটাও শুনে রাখ। মৃণালিনীকে লোকটা চিরকুমারী করে রেখেছিল নিজের জন্যে। ওর রক্ষিতার প্রয়োজন মেটাতে।

হাতুড়ির ঘায়ে রক্তস্রোত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিছানায় ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,---কিন্তু মৃণালিনী তো শুনেছি ওর---

---হাঁ, আত্মীয়া। স্নেহের সম্পর্ক। কিন্তু যে শয়তান, তার কাছে আবার সম্পর্ক। পাখিটা মরে যেতেই মৃণালিনী কিছু বুঝেছিল। আতঙ্কে মুখ ফুটে কিছু বলেনি। আমার সঙ্গে মৃণালিনী দাঁড়িয়ে দু'টো কথা বলেছে, অমনি লোকটার মুখে ক্রূর হাসি ফুটে উঠতে দেখেছি।

বালিশে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুব্রত, বোধ হয় দম নিল। অনেক পরে ওকে ভাঙ্গা গলায় বলতে শুনলুম, এখন শুনছি জ্ঞাতিরা ক্ষতিপুরণ পাবে। কিন্তু আমি ? এক দিন ছবি আঁকতুম। নাম হয়েছিল। আজ চোখ থেকে রঙ গেছে, তুলিতে ধুলো পড়েছে, শিশির, বলতে পার, আমার ক্ষতি এ জীবনে পূরণ হবে কী দিয়ে। মিউজিয়মে-রাখা ছবিগুলো শুনছি ওরা পুড়িয়েও দেবে, হয়ত দেওয়াই উচিত, কিন্তু তাতে নতুন ছবি তো তৈরি হবে না।

পর দিন সকালেই গড়পাহাড় ছেড়ে এসেছি। তখনও সূর্য ওঠেনি, কিম্বা উঠলেও কুয়াশায় ঢাকা ছিল। চুপে চুপে নেমে এসেছি সিঁড়ি বেয়ে। ধোঁয়াটে আলোয় কিছু ভাল করে চোখে পড়ে না, এখানে ওখানে জুতো ঠেকে ঠোক্কর খেতে হল। তবু সদর দরজায় পৌঁছনোর পথ টের পেয়েছি ঠিক। এই তো সেই মনসিজ রায়ের পিত্তলমূর্তি। আর এ-পাশে, হাত বাড়িয়ে ছুঁতে গিয়েও পারলাম না, শ্যাওলাধরা ইঁটগুলো যেন পিছলে গেল, এ-পাশে মনসিজ রায়ের অসমাপ্ত সেই মঠের ভিত, যেখানে বিজ্ঞান চর্চার ল্যাবরেটরি গড়ে উঠবে, তিনি এক দিন বলেছিলেন। এখন শুধু ইঁট আর আগাছার স্তূপ মনসিজের কীর্তিরই মত।

এ-মঠ কোনদিন তৈরি হবে না। সবাই যাকে আজ নির্বিবেক বলে জানে সেই মৃত মানুষটিকে স্মরণ করে কী জানি কেন, বিচিত্র একটু করুণা অনুভব করলাম।

দেউড়ি অবধি গিয়েছি, পিছন থেকে একটানা একঘেয়ে গোঙানির মত একটা আওয়াজ কানে এল। বাঘা কুকুর টাইগার ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে। আবছায়াতে কোথায় লুকিয়ে ছিল আগে দেখতে পাইনি। কুয়াশার স্তর থেকে স্তরে তার আর্তস্বর তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। মনসিজ রায়ের জন্যে কাঁদছে তাঁর একমাত্র বন্ধু!

ভয় দিয়ে যাদের জয় করেছিলেন, তারা সবাই সরে গেছে। বাঁধা পড়ে আছে একমাত্র সেই, যাকে মনসিজ ভালবাসা দিয়েছিলেন।

সম্রাজ্ঞী

টেবিলের ওপর চা আর খাবারের থালা রেখে চারু বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুরজিৎ খপ করে ওর হাতখানা চেপে ধরল। তুমি বুঝি আমাদের নতুন বামুনমাসির মেয়ে?

চারু স্থির দৃষ্টিতে একবার চাইলে ঃ তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে।—না, আমি চারু।

সুরজিৎ আরেকটু বেশি বাধা পাবে ভেবেছিল। গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়ে, হয়ত চেঁচিয়ে উঠবে কিম্বা কেঁদেকেটে সারা হবে। কিন্তু যা ঘটল, সেটা না বজ্রপাত, না বর্ষণ। কেবল মেঘলা চোখ দুটিতে ঈষৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল!

সুরজিৎ মনে মনে হাসল। ভাবল, তৈরী মেয়ে। বলল, আমি তো তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিনি, শুধু তুমি কে, তাই জানতে চেয়েছিলাম।

চারু জবাব দিলে, আমার নামটাই কি ঢের নয়। হাত ছাড়ুন, এবার যাই।

সুরজিৎ চারুকে ছেড়ে দিয়ে চায়ের বাটি নিয়ে পড়ল। না, একেবারে লবঙ্গলতা নয়। লতার মত নেতিয়ে পড়ে না, তবে লবঙ্গের ঝাঁজটুকু আছে।

আসলে চারু যে কে, সুরজিৎ আগেই তা জেনেছে, চারুর নামও শুনেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা বেড়িয়ে ফিরে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখেছে, নতুন কে একজন বিধবা রান্না করছে, তাঁকে পাশে বসে সাহায্য করছে, পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে। রান্নাঘরের ল্যাম্পটায় কয়লার কালি পড়ে ঝুল লেগেছে, পরিষ্কার বোঝা যায় না। কিন্তু মেয়েটিকে সুরজিতের ভাল লাগল। শ্যামলা, তবে কোমল নয়। শরীরের বাঁধুনিতে কাঠিন্যের ইঙ্গিত আছে।

উপরে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা কারা মা?

মা বললেন, নতুন বামুনঠাকরুন। ওদের সঙ্গে কি একটা সম্পর্কও আছে। দেশে ছিল, খেতে পেত না। একটা ছেলে, সেও সেই দুর্ভিক্ষের বছর থেকে নিরুদ্দেশ।

সুরজিৎ বললে, ওঃ, ওকে তা হলে বামুনমাসি বলে ডাকব ?

মা বললেন, ডেকো। বয়সে বড়, সম্পর্কও তো আছে। আশ্রয়ে এসে পড়েছে, একেবারে ফেলতে তো আর পারিনে। ওদেরও উব্‌গার হবে, আর রান্নাবান্না ঠিক মত করে যদি, আমাদেরও।

মার কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা যায়, তিনি খুশি হয়েছেন। এই বাজারে কলকাতা শহরে বামুনঠাকুর, চাকর মেলে না, যদি বা মেলে, অগ্নিমূল্যে, এবং বিত্ত ও জীবনযৌবনের মতই তারা ক্ষণস্থায়ী। তার চেয়ে অর্ধআত্মীয় এই সব লোক দিয়ে কাজও ভাল পাওয়া যায়, সস্তাতেও হয়।

স্ত্রীর ঘরে এসে দেখে, সে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে ললিতা।

সুরজিতের স্পর্শে ললিতা পাশ ফিরে অনেক কষ্টে চোখ মেলে তাকাল। কপালে গালে পাউডারের ছোপ তখনও লেগে রয়েছে। বোঝা যায়, প্রসাধন সম্পূর্ণ করতে পারেনি।

ললিতা বললে, হার্ট ট্রাবলটা বড় বেড়েছে।

সুরজিৎ উঠে টেবিলটার কাছে গেল। ওষুধ মেজার গ্লাসে ঢেলে ললিতাকে খাওয়াল। তারপর ফের শুইয়ে দিয়ে বলল, তুমি একটু ঘুমোও! আমি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।

ললিতা বলল, তুমি একটু বসো।

অগত্যা সুরজিৎকে বসতে হল! টেবিলের ওপর থেকে তিনবার পড়া সকালের কাগজখানা টেনে নিয়ে আরেকবার আদ্যোপান্ত পড়লে। তখনও ললিতা ঘুমোয়নি।

মনে মনে সুরজিৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। সেধে আচ্ছা শিকল

পরেছে পায়ে। রুগ্না স্ত্রীর বিছনার পাশে বসে থাকার মত অস্বস্তিকর কিছু নেই। এর চেয়ে তারকেশ্বরে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকা ভাল। তাতে অন্তত আধ মিনিট অন্তর অন্তর উঃ আঃ শুনতে হয় না।

ললিতাকে কি দেখে সুরজিৎ পাগল হয়েছিল সে কথা এখন স্মরণ হয় না। বড়লোকের মেয়ে, একসঙ্গে পড়ত। কলেজের ম্যাগাজিনে নারীজতির অধিকার নিয়ে প্রবন্ধ লিখত। বিতর্ক-সভায় পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের যুক্তিতে না হোক, তীক্ষ্ণ বাক্যবিন্যাসে ধরাশায়ী করত!

বস্তুত এ বিয়েতে মায়ের বিশেষ মত ছিল না। তাঁর আপত্তির প্রধান কারণ ছিল, ললিতা সুরজিতের সমবয়সী। কিন্তু সুরজিৎ তখন কর্ণপাত করেনি। আর এখন আপসোস নিষ্ফল।

স্বাস্থ্য? ললিতার স্বাস্থ্য কি এত খারাপ ছিল, কলেজে পড়বার সময়? বিয়ের পরও তো অনেকদিন ভালই ছিল। দাম্পত্য-জীবনে সুখ দুর্লভ, তবু সুরজিতের মনে হয়, বিয়ের পর প্রথম বছরটা ওরা সুখীই ছিল। মতান্তর হত কেবল একটা বিষয়ে, ললিতা কিছুতেই ছেলে চাইত না। শেষে সুরজিতের অনেক পীড়াপীড়িতে একবার সম্মতি দিয়েছিল। আর বিপত্তিও হল সেই থেকেই। বরাবরই নার্ভাস, সন্তান সম্ভাবনার পর ললিতা যেন একবারে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। বারবার মূর্ছা ইত্যাদি হতে লাগল। শেষে সাতমাসে একটি মরা ছেলে প্রসব করে নিষ্কৃতি পেল বটে, কিন্তু হার্টের ব্যারাম সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে রইল।

রাত্রে খেতে বসেই দেখেছে বামুনমাসিকে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে পরিবেশন করছিলেন অন্নদা। সুরজিতের মা পাশে বসেছিলেন। দীর্ঘ ঘোমটা, স্বল্প আলো, অনভ্যস্ত হাত। খানিকটা ভাত ঠিকরে পড়ল থালার পাশে, খানিকটা আসনে, খানিকটা সুরজিতের জামায়।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, ছেলের বয়সী, সম্পর্কে বোনপো। ওকে

আবার লজ্জা। তুমি অত বড় ঘোমটা দিওনা বাপু। এখানে ওসবের রেওয়াজ নেই।

আড়াল থেকে একটি মেয়ে বামুনমাসিকে সব জোগান দিচ্ছে, সুরজিৎ বুঝতে পেরেছিল।

হঠাৎ বললে, একটু জল।

বামুনমাসি সুরজিতের মাকে ফিসফিস করে বললেন, আমার হাত দু'টো যে এঁটো দিদি।

মা বললেন চারু, দিক।

সুরজিৎ সেই প্রথম, সামনাসামনি চারুকে দেখতে পেল। আনত হয়ে জগ থেকে গ্লাসে জল ঢেলে দিচ্ছিল। সুরজিৎ দেখলে ঘন চুলে বিন্যস্ত কবরী, সুপুষ্ট বাহু, চিকন রোমবহুল গ্রীবামূল, আরও যা দেখলে, তারজন্যে দুঃশাসন চোখ দু'টিকে সুরজিৎ মনে মনে তিরস্কার করলে।

খাওয়া শেষ হবার আগেই সুরজিতের মা উঠে গিয়েছিলেন। অন্নদা মৃদুস্বরে বললেন, পেট ভরল তো বাবা?

সুরজিৎ হেসে উঠল, একি পরের ভাত খাচ্চি মাসিমা, যে লজ্জা করে খাব? অনেকদিন খেয়ে এমন তৃপ্তি পাইনি।

তারপর আরও দু'চারদিন কেটেছে। চারুকে সুরজিৎ দেখছে, কিন্তু সোজাসুজি কথা বলার সুযোগ হয়নি। চারু যদিও দৃষ্টি এড়ায়নি, কিন্তু পালিয়ে বেড়িয়েছে। সুরজিৎ মনে মনে হেসেছে। বেড়াক, বলির ছাগশিশুকেও তো মানুষ ঘাসপাতা খেতে দেয়, চারুর স্বাধীনতাও তেমনি। একবার যখন এসেছে, তখন সুরজিতের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল বলে।

সেদিন সকাল বেলাকার হাত ধরে ফেলার কথা সুরজিতের মনে হয়েছিল, চারু হয়ত ওর মাকে বলে দেবে। কিন্তু দু'দিন কেটে গেল, কিছুই ঘটল না দেখে স্বস্তি বোধ করল। সাহসও বাড়ল। সাড়াটা যদি এ পক্ষের হয়, ও পক্ষের সায় নিশ্চয়ই আছে।

ওদের জন্যে নিচের তলায় একটা ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল। সেদিন অফিস থেকে ফেরবার পথে সুরজিৎ সেখানে নিতান্ত কৌতূহলবশে একবার উঁকি দিলে।

তক্তপোশের ওপর শুয়ে চারু কি একটা বই পড়ছিল। সুরজিৎকে দেখে বইটা বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেললে।

—তোমার মা কই খুকি।

চারু উঠে বসল। আঁচল ঠিক করে নিয়ে উঠে বসল।—আমি খুকি নই!

—তুমি তবে কী।

—চারু।

—আচ্ছা বেশ। তোমার মা কোথায়?

সুরজিৎ লক্ষ্য করলে, চারু মুখ টিপে টিপে হাসছে। মাকে খুঁজতেই ঘরে ঢুকেছিলেন নাকি?

গ্রাম্য হলে কি হয়, সব বোঝে চারু।

সুরজিৎ মনে মনে হাসল।

চারু বললে, কালীঘাটে, মাসিমার কি একটা মানত ছিল, সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

সুরজিৎ ততক্ষণ তক্তপোশটার ধারে বসে পড়েছে, চারু একটু সরে বসতে গেল, কিন্তু আঁচলের ভেতর থেকে বইখানা পড়ে গেল।

—কী বই দেখি, সুরজিৎ ঝুঁকে পড়ল। চারু ততক্ষণ বইখানার ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে।

একপশলা ঝর্ঝর বর্ষার মত কাড়াকাড়ির অবসানে দেখা গেল বইখানা সুরজিতের দক্ষিণকরতলগত, বাম হাতের মুঠোয় চারুর শিথিল আঁচলের একটা প্রান্ত। চারু পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে, খোঁপা খুলে পিঠে, কানের দু'পাশে, দীর্ঘ কালো চুলের ঢল নেমেছে।

সুরজিৎ বইখানার পাতা উল্টে দেখলে, একখানা নভেল। নামকরণ থেকে অনুমান হল নিছক প্রেমোপাখ্যান। গম্ভীর ভাবে বললে, এই সব পড়ছিলে?

—বেশ করছিলুম। চারু উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আঁচল ছাড়ুন। কেউ দেখে ফেলবে।

সুরজিৎ হঠাৎ পুলকিত হল। আঁচল ধরে ফেলায় রাগ করেনি। শুধু কেউ দেখে ফেলার ভয়।

কানের কাছে মুখ নিয়ে সুরজিৎ বলল, ফেলুক না। লুকোচুরির হাত থেকে বেঁচে যাই।

চারুও একটা ভ্রূভঙ্গি করে কি বলতে যাচ্ছিল, সদরে গাড়ির শব্দে অপরূপ বিশ্রম্ভালাপে ছেদ পড়ল। মা আর মাসিমা এসেছেন বুঝি।

তিন লাফে সুরজিৎ সিঁড়ি অতিক্রম করল; মন লঘুপক্ষ পাখির মত আনন্দের মেঘলোকে উধাও।

ঘরে ঢুকতেই ললিতা চিঁচিঁ করে বলে উঠল, কী গো এতক্ষণ কোথায় ছিলে! আমি সেই কখন থেকে একা বসে আছি—

সুরজিৎ বললে, কেন চারুকে ডেকে নিলেই পারতে।

ললিতা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললে, বয়ে গেছে। এই গেঁয়ো ভূতটার সঙ্গে কথা কইতে হলে আমার জ্বর এসে যেত। ও জানে কী। ওর আছে কী।

সুরজিৎ অনুচ্চকণ্ঠে বলল, শরীর আছে। প্রকাশ্যে চিররুগ্না এই মেয়েটিকে সান্ত্বনা দেবার ছলেই ঈষৎ আদর করল।

একটু পরে ললিতা বললে, বেড়াতে যাবে আজ? আমার শরীরটা আজ ভাল লাগছে বেশ।

ললিতা সাজলে অনেকক্ষণ ধরে, ঘটা করে। দু'জনে মিলে নীচে নামছে, সিঁড়ির মুখে চারুর সঙ্গে দেখা। চারু এরই মধ্যে কখন গা ধুয়েছে, গাঢ় কালোপেড়ে ফর্সা শাড়ি পরেছে একটা।

ললিতা যে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে এই গর্বেই টস্ টস্ করছে। সেধেই চারুর সঙ্গে একটু আলাপ করলে, কী চারু কী করছ। অর্থাৎ চারু দেখুক ললিতার ঐশ্বর্য। কেবল স্বাস্থ্যই নেই ললিতার, আর সব আছে। বহুমূল্য শাড়িতে আর গহনার জলুসে

বুড়িয়ে যাওয়া দেহটাকে মুড়ে দেবার ক্ষমতা আছে। যুবক স্বাস্থ্যবান স্বামী আছে।

সুরজিৎ বললে, চারুও চলুক না, আমাদের সঙ্গে? কলকাতার কিছু ত দেখেনি, দেখে আসবে।

ললিতার মুখখানা নিস্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকাশ্যে অমতই বা করবে কী করে। সুতরাং চারুও গেল।

ভবানীপুর গাড়ি আসতেই ললিতা বললে, আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। আমি আর যাব না। এখানে গীতাদের বাড়ি নামব।

গীতা ললিতার বোন। শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। সুরজিৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শরীর খারাপ হয়েছে ললিতার? কী কাজ তবে বেড়িয়ে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিক সুরজিৎ?

ললিতা বললে, না। চারু শখ করে এসেছে।

সুরজিৎ বললে, কখন এসে তোমায় ফের তুলে নিয়ে যাব?

ললিতা বললে, এসে কাজ নেই, একটু সুস্থ হলে আমি নিজেই বরং একটা গাড়ি নিয়ে ফিরে যাব।

সুরজিৎ সন্দিগ্ধ চোখে ললিতার দিকে তাকাল। ললিতার চোখে সেই দৃষ্টি—যে-দৃষ্টি নিয়ে লোক জুয়ায় শেষ বাজি ধরে। 'চারুর শরীর আছে'—সন্ধ্যাবেলা সুরজিতের অনুচ্চকণ্ঠের এই কথা ক'টি ললিতা শুনতে পেয়েছিল নাকি! আজ অবিশ্বাস্য উদারতা দেখিয়ে ললিতা প্রমাণ করতে বসেছে যে শরীরের প্রতিযোগিতায় চারুর কাছে হার মানলেও, মনের প্রতিযোগিতায় সে অনেক ওপরে।

সুরজিৎ একটু ইতস্তত করছিল, কিন্তু লোভই শেষ পর্যন্ত জয়ী হল। ললিতাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে দিলে গড়ের মাঠের দিকে।

যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই চারু এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। সেই যে নিঃশব্দে এসে গাড়ির পিছনের সীটে বসেছে তো বসেই আছে।

সুরজিৎ বললে, কত আলো দেখেছ চারু। মাঠের দিকে চেয়ে দেখ মালার মত দুলছে। হেসে বলল, তোমাদের দেশে এত আলো নেই, কী বল।

চারু জবাব দিলে না।

সামনে এসে বসবে চারু! কী চমৎকার লাগবে দেখো। গাড়ি থামিয়ে সুরজিৎ বললে।

নিরুত্তর চারু পাশে এসে বসল। মাঠের মধ্যে গাড়ি খুব আস্তে চলছিল। সুরজিৎ একটা হাত স্টিয়ারিংয়ে রেখে অপর একটি হাতে চারুর কটি বেষ্টন করলে। চারুর দিক থেকে প্রতিস্পন্দন এলো কি? কিন্তু অত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করার অবসর কই সুরজিতের। তাকে আর এই স্বল্পবাক্ গ্রাম্য মেয়েটিকে নিয়ে নতুন যে নাটক জমে উঠেছে এই নির্জন প্রান্তরের পটভূমিতে, ললিতা নিজেই তার সূত্রধার। আর কাউকে পরোয়া করে না সুরজিৎ।

প্রায় আধ ঘণ্টাস্থায়ী উন্মত্ততা জুড়িয়ে এলে চারুই প্রথম কথা বলল।

—ফুরিয়ে গেলেন?

সুরজিৎ ফুরোয়নি, দম নিচ্ছিল মাত্র। অপলক দৃষ্টিতে সে চারুর দিকে চেয়ে রইল। জিভে বড় ধার চারুর।

ঘাসের দিকে তাকিয়ে চারু বলল, ভাবছি আমাকে নিয়ে কি করবেন। এখনও হয়ত সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায়নি, যেটুকু আছে, আশ্রয়ের বিনিময়ে সেটুকু আপনাকে নিঃশেষে দিতে পারব। কিন্তু তারপর?

সুরজিৎ বলল, নাটক নভেল পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে চারু। এ জিনিসটাকে ওভাবে নিচ্ছ কেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে প্রয়োজন, আমরা তার ডাকেই সাড়া দিয়েছি।

বাড়ি ফিরে সিঁড়ির মুখে মার সঙ্গে দেখা হল। একদৃষ্টে দু'জনের দিকে চেয়েছিলেন তিনি। চারু ঘরে ঢুকে গেল। সুরজিতের

বুকটা কিন্তু দুরদুর করতে লাগল। প্রথম দিন লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে বাড়িতে এসে যেমন করেছিল।

মা কিন্তু কিছু বললেন না। শুধু বললেন, ললিতা আজ আসবে না খবর পাঠিয়েছে। তোমার ভাত টেবিলে ঢাকা দেওয়া আছে, খেয়ো।

চারু অনুভব করছিল, এ বাড়িতে ওর সমীহ কিছু বেড়েছে। চারুর মা অন্নদা তো রীতিমত ভয়ই করেন মেয়েকে। সুরজিতের মা ও চারুর মা কী চাই-না-চাই সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন।

বিকেলবেলা ললিতা আজকাল ওকে ডেকে নিয়ে সাজাতে বসে।

চুল বাঁধা সারা হলে ললিতা যখন ওকে হালকা সবুজ রঙের একটা শাড়ি পরিয়ে দিতে আসে, চারু বিব্রত হয়ে পড়ে। এ সবটাই যেন বড় বেশি প্রকাশ্যভাবে ঘটছে, চারুর মনে হয়। প্রথমটাই যেন পটের আড়ালে থেকে ফিসফিস না করে, নিজেই মঞ্চের সমুখে এসে তারস্বরে চাংকার করতে শুরু করেছে। সুরজিতের সঙ্গে চারুর যে সম্পর্ক তা যেন বড় বেশি বে-আব্রু। সকলে জানে, সকলে বোঝে, এমন কি সবার সম্মতিক্রমেই যেন ঘটছে। চারুর মা অন্নদা খুশি, তার কারণ বোঝা যায়। মেয়ে যদি বাড়ির মালিকের সুনজরে পড়ে তবে বাড়িতে তাঁর আসন পাকা। এরই মধ্যে তিনি নিজের সাধের দুধ বরাদ্দ করে নিয়েছেন। আবার পুজোর পর গিন্নীর সঙ্গে তীর্থে যাবেন বলে বায়নাও ধরেছেন।

সুরজিতের মার মনস্তত্ত্ব খানিকটা বোঝে চারু। রুগ্না একটা স্ত্রী নিয়ে চিরকাল সুরজিতের মত সুস্থ, সবল ছেলেকে ঘর করানো অসম্ভব হবে ; তার চেয়ে যদি ছেলে চারুকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে, করুক না। ঘরে তো থাকবে। খেলনা দিয়ে ছেলে ভোলাতে হয়, চারু সুরজিতের মায়ের হাতের সেই খেলনা।

আর ললিতা। ললিতাকে সবটা বোঝে না চারু। কী স্বার্থ আছে ললিতার সুরজিৎ আর চারুকে নিয়ে এমন সর্বস্বপণ জুয়া

খেলায়। চারুকে বিকেলে যখন সাজাতে বসে ললিতা, তখন যেন বড় বেশি নির্লজ্জ হয়ে ওঠে। প্রতিটি সজ্জা নিজে হাতে পরিয়ে দেবার জন্য ললিতা যখন পীড়াপীড়ি করে, তখন বড় বিব্রত বোধ করে চারু। হোক না ললিতা মেয়েমানুষ, তবু অপরের সমুখে অতটা অনাবৃত হতে চারুর কেমন অস্বস্তি লাগে। আর ললিতা যখন মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারুর দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, শিউরে ওঠে চারু। সে দৃষ্টিতে কেবল ঈর্ষাই থাকে না। বিমুগ্ধ চাটুবাক্যও না। নিজের বিগতযৌবন দেহটাকে সহস্র প্রয়াসেও ললিতা যে অপরূপ করে তুলতে পারে না, চারুকে সাজিয়ে সেই ক্ষোভ যেন মেটাতে চায়। চারুর প্রসাধন-পুষ্পিত দেহের মধ্য দিয়ে ললিতা সুরজিতের কাছে পৌঁছতে চায়। কেননা, দেহ তো সবটাই চারুর নয়। ওর রূপের, ওর অপরূপ সম্ভাবনাময় স্বাস্থ্য-চিক্কণ দেহের যে মোহ, তার খানিকটা তো ললিতারও সৃষ্টি। মানুষ-ললিতার প্রয়োজন সুরজিতের ফুরিয়েছে, কিন্তু চারুকে সে যখন সপ্রশংস হৃদয়াবেগে কাছে টেনে নেয় তখন বুঝি আর্টিস্ট-ললিতাকেও মনে মনে তারিফ করে। সেইটুকুই ললিতার।

আর সুরজিৎ যেন ক্ষেপে উঠেছে। প্রথম প্রথম যেটুকু দ্বিধা ছিল, সংশয় ছিল, সেটুকুও আর নেই। ওর স্পর্শে চারু ফুটে উঠেছে, সেই উন্মাদনাই সুরজিতের যথেষ্ট। শরীরসর্বস্ব একটা জড়পুত্তলী মাত্র ছিল, সুরজিৎ তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছে। প্রতিদিন সিনেমা, বিকেলে বেড়ানো, হোটেলে খাওয়া। চারুর ঘর এখন দোতলায়। গভীর রাতে সেখানে চুপে চুপে গিয়ে দরজায় ঠক ঠক করার মধ্যে অপরূপ উত্তেজনা। উত্তেজনা, কিন্তু আশংকা নেই। মা জানেন, বামুন মাসি জানে, ললিতাও জানে। এইভাবেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে নাকি সুরজিৎ। সামাজিক প্রয়োজনে ললিতা আর শারীরিক প্রয়োজনে চারু। মনে মনে সুরজিৎ হিসেব করে। মন্দ কী!

চারুর মনে কিন্তু সংশয় জমে উঠেছিল। এত অপর্যাপ্ত পাওয়ার

মধ্যে আক্ষেপের একটু অঙ্কুর কোথায় যেন লুকিয়ে আছে। সুরজিৎ তাকে অজস্র দিয়েছে, কিন্তু এই কি চারুর পুরো দাম? দু'ডজন শাড়ি আর দু'সেট গহনা? এত সস্তা চারু।

বাড়িতে বন্ধুরা এলে তারা চারুর কাছে আসে না, ললিতার ঘরেই যায়। ঠাট্টা করে, ইয়ার্কি করে। ললিতা সব খুইয়েছে, কিন্তু ঐ একটুখানি কর্তৃত্ব অবশিষ্ট আছে। এ বাড়িতে ললিতাই গৃহিণী। বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে সুরজিৎ চারুর সঙ্গে তাদের আলাপ করিয়ে দেয় না তো। চারুকে একটু দাঁড়াতে বলে সরে যায়। বন্ধুর সঙ্গে দু'দণ্ড আলাপ করে ফিরে আসে।

একটুখানি ক্ষোভ জমে ওঠে চারুর মনে। কিন্তু স্থায়ী হয় না। সুরজিতের আবেগের বন্যায় ধুয়ে যায়।

সেদিন একজন বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। সাগ্রহে সে সুরজিতের হাত দু'টো ধরে বার তিনেক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, অনেকদিন বাদে তোকে পাকড়ানো গেছে।

চারু একটু আড়ালে সরে গিয়েছিল। ওদের কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। নানা কথার পর বন্ধু বললে, মিসেসের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবি না?

চারু লক্ষ্য করল, সুরজিৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আমতা আমতা করে সুরজিৎ বন্ধুকে বললে, তুই ভুল করছিস। মিসেস নয়।

চোখ টিপে বন্ধু বলল, বিবাহের চেয়ে বড় কিছু বুঝি।

চারু স্পষ্ট শুনতে পেল, সুরজিৎ বলছে,—দূর, ওসব কিছু নয়। আমাদের বাম্‌নীর মেয়ে।

বন্ধু সকৌতুকে হেসে বললে, খাসা জুটিয়েছিস কিন্তু মাইরি। তোর লাক্ আর প্লাক্ দুই-ই আছে।

সেদিনও ওরা হোটেলে গেল, কিন্তু কোন ভোজ্যদ্রব্যই মুখে রুচল না চারুর। সিনেমা হলেও সব কিছু বিস্বাদ লাগল। ফেরবার পথে গাড়িতে বসে সুরজিৎ যখন চারুর অঙ্গস্পর্শ করল, চারু ততক্ষণ মনঃস্থির করে ফেলেছে।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল চারু। সুরজিতের হাতখানা ঠেলে দিয়ে বলল, আপনি আমায় বিয়ে করবেন সুরজিৎবাবু ?

সুরজিৎ হতভম্ভ হয়ে গেল। চারু হঠাৎ বলে কী !

—বিয়ে ? তোমাকে ?

কঠিন ব্যঙ্গের সুরে চারু বললে, কেন, আমি যোগ্য নই, না ? আমাকে নিয়ে সব পারেন, বেড়াতে, সিনেমা দেখতে, একতলার ঘর থেকে দোতলায় প্রমোশন দিতে, পারেন না শুধু বিয়ে করতে, না ? বাম্‌নীর মেয়েকে বিয়ে করতেই শুধু বুঝি মান যায় ?

বাড়িতে যখন ফিরে এল চারু, তখনও ওর তাপ জুড়োয়নি ! কোনক্রমে পোশাকগুলো ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ওর মা ডাকতে এসে সাড়া পেল না। খানিক পরে চারু নিজেই উঠে অন্নদার কাছে গেল।

—এখান থেকে চলে যাই, চল মা।

মা তখন রান্না করছিলেন। হাতের খুন্তি স্তব্ধ হয়ে গেল। বললেন, সেকি ?

চারু মা'র কাছে এসে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল। কোন কথা বলল না, খালি মা'র বুকের মধ্যে মুখ ঢেকে বলল, এসব ঐশ্বর্য চাইনে মা, তুমি শুধু এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল। দেশে গিয়ে বরং গরীবের একটি ছেলে ডেকে আমাকে বিয়ে দিয়ে দিয়ো। কিন্তু এখানে নয়।

অন্নদার সমস্ত অঙ্গ কঠিন হয়ে উঠল। সর্বনেশে এ-কী কথা বলে চারু। বেশ তো চলছিল এখানে। দেশে খাওয়া পরার কী যে সুখ এক বছরে তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন। এক বেলা ভাত জোটাতে লোকের দরজায় দরজায় ফিরতে হয়েছে, সে স্মৃতি ভোলেননি তিনি। তারপর বয়স্কা মেয়ে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে ওঠার সাহস নেই তাঁর। একটা আগল পর্যন্ত নেই। পাড়ার ছেলেরা এসে শিস দিতে, ঢিল ছুঁড়তে শুরু করেছিল। এতদিন দেশে থাকলে কুকুরেরা সব চেটে-পুটে খেতো। এখানে তবু দেবতার ভোগে

লাগছে। দেবতাই তো। সুরজিৎ দেবতা নয়ত কী। তাঁদের থাকতে দিয়েছে, পরতে দিয়েছে। চারুকে তো রাজরানী করে রেখেছে। বিয়েই খালি হয়নি। তা দু'টো মন্তরই কি সব? আজ চারুর মা'র এই যে ঘৃতপক্ক হবিষ্যান্ন জুটছে, এসব দেশে আসত কোথা থেকে। দু'দিন একটু সুখে আছে, চারুর আর সেটা সইছে না। দেশে জাতও যেত, পেটও ভরত না। এখানে জাত যায়নি, পেটও ভরছে। এখনও চারুর মাকে রান্নাটা করতে হচ্ছে বটে, কিন্তু আশা আছে চারু আরেকটু জেঁকে বসলে কিছুই করতে হবে না।

মায়ের যুক্তির বহরে চারু স্তম্ভিত হয়ে গেল। ওর দীপ্ত চোখ দু'টি অনেকক্ষণ কেবল ঘৃণা বর্ষণ করল। তারপর কখন চারু আস্তে আস্তে উঠে গেল।

পরদিন সকালে চারুকে দেখা গেল না। চারুর মা ক্রমাগত কাঁদতে থাকল। দুর্বুদ্ধির জন্যে বার বার অভিশাপ দিল মেয়েকে। সুরজিৎ প্রথমটা একটু চকিত হল, ক'দিন বাদে সব ভুলে গেল। বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিলে, বেড়ে বাগিয়েছিলি, ফস্‌কে গেল? ওসব মেয়ের নাগ্নে সুখমস্তি। ভূমাতেই সুখ। আরও শাড়ি চাই, গাড়ি চাই, বাড়ি চাই। রক্তের স্বাদ একবার পেয়েছে, আর কি একজনে মন ওঠে চারুর। সুরজিৎ ভাবলে, হয়ত তাই।

ললিতার শরীর ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছিল। হার্টের ট্রাবল বেড়েছে যেমন, ভক্তিও বেড়েছে তেমন। ললিতাকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে দিনকতক ঘুরলো সুরজিৎ। এককালে কলেজের ক্ষুর-রসনা, বহু তর্কযুদ্ধের বিজয়িনী ললিতা শুধু যে ধর্মপ্রাণা হয়েছে তা নয়, টোটকা, মাদুলি, জলপড়া, অবধূত, সব কিছুতে তার অচল বিশ্বাস। বিশ্বাস নেই শুধু ডাক্তারি চিকিৎসায়।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সুরজিৎ আর ললিতা উত্তর ভারতের যে শহরে ছিল, সেটা প্রাচীন শহর হিসাবে যেমন দর্শনীয়, পীঠস্থান হিসাবে তেমনি পবিত্র। ক'দিন ললিতার অল্প অল্প জ্বর

হয়েছিল ; মন্দিরে আসতে পারত না। সুরজিতের কাজ হল রোজ মন্দিরে এসে শান্তি জল নিয়ে যাওয়া।

মন্দিরের কাছাকাছি আসতেই সুরজিৎ দেখল, একটি পাণ্ডা ওকে অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছে। শাঁসালো শিকার ভেবেছে বোধ হয়। সুরজিৎ ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে যাচ্ছিল, লোকটা এসে নমস্কার করলে।

—আজ্ঞে আমি বিষ্ণুপদ।

বিষ্ণুপদ ? এ নামে পরিচিত কাউকে সুরজিতের মনে পড়ল না। মুখটা একটু চেনা চেনা বোধ হচ্ছে বটে।

—আমি কলকাতায় আপনাদের পাশের বাসায় দিনকতক রাঁধুনি বামুনের কাজ করেছিলাম বাবু।

—তাই নাকি। হবে। সুরজিৎ নিরাসক্ত ভাবে জবাব দিলে।

—আমার দোকানে আসবেন ? দেবীদর্শন করিয়ে দেব। দেব শান্তিজল…

সুরজিৎ ভাবলে মন্দ কী। আরেকটু এগিয়ে গেলেই তো হাজারটা পাণ্ডা এসে ছেঁকে ধরবে, তার চেয়ে আগে থেকে এক-জনের হাতে আত্মসমর্পণ করা অনেক নিরাপদ।

বিষ্ণুপদ বললে, আমার বাসায় ডালি সাজানোই রয়েছে। কাছেই বাসা। আসুন না বাবু—

গোটা কতক গলিতে গোলক-ধাঁধার মত ঘুরে সুরজিৎ যে-বাসার সমুখে এসে দাঁড়াল, সেটা একটা জীর্ণ, অন্ধকার, খাপ্‌রার দোচালা। কড়া ধরে নাড়তেই যে স্ত্রীলোকটি এসে দরজা খুলে দিল, তাকে নিষ্প্রদীপের মধ্যেও সুরজিৎ চিনতে পারল। চারু।

শতচ্ছিন্ন একটা লালপেড়ে শাড়ি পরে আছে চারু। মাথায় সামান্য অবগুণ্ঠন। স্বাস্থ্যের সেই প্রাচুর্য আর নেই, কিন্তু কৃশ মুখখানার ওপর সিঁথির সিঁদুরের গভীর রেখা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুপদ বললে, আমার স্ত্রী।

এই নতুন পরিবেশে চারুকে কল্পনা করতেও সুরজিতের অদ্ভুত লাগছিল। কোথায় ছিল চারু দ্বিতল হর্মে, ঐশ্বর্যের স্তূপে, রাজরানী হয়ে। মোটরের চাকায় দিনগুলো গড়িয়ে যেত। আর এ কোথায় নেমে এসেছে। গড়াতে গড়াতে চাকা শেষে এসে ঠেকল কি এই সংকীর্ণ গলির শেষে বস্তির বিষ্ণুপদ পাণ্ডার কুঁড়ে ঘরে? কোথাও এতটুকু শ্রী নেই, চারপাশে শুধু পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য।

সুরজিৎ ভেবেছিল, চারু ওকে দেখে চমকে উঠবে, লজ্জায় মিশিয়ে যাবে মাটিতে। ঘর ছেড়ে একদিন পালিয়ে এসেছিল, সেই লজ্জাতেই শুধু নয়, সব কটা ধাপ নেমে এসে আজ এই হতশ্রী পরিবেশের মধ্যে সুরজিৎকে অভ্যর্থনা করতে হচ্ছে, সেজন্যও।

আশ্চর্য, চারুকে কিন্তু মোটেই বিব্রত দেখাল না। মাথার ঘোমটা অল্প একটু টেনে দিয়ে এগিয়ে এল, নমস্কার, চিনতে পেরেছেন?

অল্প একটু কাষ্ঠহাসি হেসে সুরজিৎ বলল, পারা একটু শক্ত বটে। তুমি পেরেছ?

চারুর ঘরে বসবার কিছু আসবাব ছিল না। ঘরের কোণে ছিল ছেঁড়া একটা মাদুর, নিঃসংকোচে সেইটে টেনে এনে সুরজিতকে বসতে বলল।

সুরজিৎ বলল, বসব না। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, বিষ্ণুপদ আশে পাশে নেই। সুরজিৎ বলল, তোমাকে কিন্তু এভাবে দেখব আশা করিনি চারু।

একটু আগে চারু ছেঁড়া একটা সেমিজ সেলাই করছিল বুঝি। সেটাকে হাতে ফের তুলে নিয়ে বলল, কেন, মন্দ কি দেখছেন।

বিষ্ণুপদ স্নান করছিল বোধ হয়। সেই অবসরে চারু অনেক কথা অনর্গল বলে গেল। মাসিমা কেমন আছেন? মারা গেছেন? কবে? ললিতাদি?

সুরজিৎ দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, তার আর থাকা না থাকা। বেঁচে আছে এই পর্যন্ত।

হঠাৎ সুরজিৎ করল কি, চাপা গলায় অথচ আবেগের সঙ্গে বলল, তোমার মা কিন্তু এখনো আমাদের কলকাতার বাসাতেই আছেন চারু। ফিরে যাবে আমার সঙ্গে ?

যে মাথায় ছেঁড়া ঘোমটার ফাঁকে সীমন্তের সিন্দূর জ্বল জ্বল করছে, সেই মাথা উঁচু করে তাকাল চারু। সহজ, দীপ্ত, নিঃসঙ্কোচ।—আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে,—শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে চারু বলল, নইলে একথা বলতে পারতেন না। দেখছেন এখানে সংসারে জড়িয়ে রয়েছি। গেরস্থালি আছে, স্বামী আছেন, সব ফেলে হুট করে যাই কী করে, বলুন ? বলে চারু একটু হাসল। স্থির, আয়ত দৃষ্টিতে কল্যাণী স্নিগ্ধতা। সুগভীর তৃপ্তি। সুরজিতের মনে হল, সে দৃষ্টিতে সামান্য একটু অহংকারও বুঝি আছে। অবাক লাগল। এই অহংকার এলো কোথা থেকে চারুর। কী দিয়েছে তাকে এই অর্ধশিক্ষিত দরিদ্র পাণ্ডা বিষ্ণুপদ, সুরজিতের কাছে চারু যা পায়নি ?

চলে আসবার সময় চারু বলল, আসবেন মাঝে মাঝে। আমার স্বামীর সঙ্গে তো আলাপ হল, আমার বাসাও চিনে গেলেন—

আমার বাসা। আমার স্বামী। চারুর এই ছোট দু'টি কথার মধ্যেই সুরজিতের মনে হল ওর সমস্ত বিস্ময়ের জবাব রয়েছে।

রাস্তায় নেমে এসেও সুরজিৎ একবার পিছনে ফিরে চাইল। তিরিশ-দুই-এক-এফ কৃপাশংকর বাই লেন। দরজার কপাটে খড়ি দিয়ে লেখা আছে, পাণ্ডা শ্রীবিষ্ণুপদ শর্মার নাম। সুরজিতের কেমন সন্দেহ হল, হয়ত বিষ্ণুপদর সঙ্গে আজকের সাক্ষাৎটা আকস্মিক নয়। হয়ত চারুই চেয়েছিল ওকে ডেকে আনতে। মুখোমুখি এনে জব্দ করতে। চৌকাটের ওপর এখনো দাঁড়িয়ে আছে চারু। বামুনমাসির মেয়ে নয়,—এই জীর্ণ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার খোলার ঘরে চারু সম্রাজ্ঞী।

———